রাজন্য আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্পাদনা

ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী

রাজন্য আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা

সম্পাদনায়
ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী

উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র
ত্রিপুরা সরকার

''রাজন্য আমলে শিক্ষা ব্যবস্থা'' ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশনায়ঃ বিজয় দেববর্মা, অধিকর্তা,
উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র,
ত্রিপুরা সরকার।

প্রথম প্রকাশঃ মার্চ, ২০০৭ ইং।

মুদ্রণেঃ প্রিন্ট বেষ্ট, কর্ণেল চৌমুহনী, আগরতলা।

প্রচ্ছদঃ

মূল্যঃ ২৭ টাকা।

গ্রন্থস্বত্ব উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র কর্তৃক সংরক্ষিত

এস কে দাস, আই. এ. এস.
কমিশনার ও সচিব
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

ভূমিকা

ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের উপজাতিদের জীবন সংস্কৃতি মান-উন্নয়নে, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, আদিবাসীদের জীবন, অতীত ও বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের উপর গবেষণামূলক পুস্তকাদি প্রকাশে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমান পরিসরে ডঃ শ্রীদ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী রাজন্যশাসিত আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর একটি তথ্যবহুল গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশের জন্য হস্তান্তর করায় ডঃ গোস্বামীকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তকটি সাধারণ ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র এইরূপ মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য অভিনন্দন জানাই।

এস কে দাস
কমিশনার ও সচিব
ত্রিপুরা সরকার

মার্চ ২০০৭ ইং
আগরতলা

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী
মন্ত্রী
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

শুভেচ্ছা

উপজাতি গবেষণা কেন্দ্র, ত্রিপুরার উপজাতিদের জীবন সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষার মান উন্নয়নে বহুমুখী কর্মকাণ্ডের পাশে তথ্যবহুল ও গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি।

ডঃ শ্রী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী রাজ্যের একজন কৃতি শিক্ষাবিদ। রাজন্যশাসিত আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা নিয়ে তথ্যসমৃদ্ধ একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ এই কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার জন্য হস্তান্তর করায় উনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পুস্তকটি সাধারণ পাঠক, বিদ্যোৎসাহী, ছাত্রছাত্রী ও বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হবে বলে মনে করি।

আমি উপজাতি গবেষণা কেন্দ্রের পুস্তক প্রকাশনায় এইরকম উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শ্রী জিতেন্দ্র চৌধুরী
মন্ত্রী
উপজাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

মার্চ ২০০৭ ইং
আগরতলা

ভূমিকা

সর্বসাধারণের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ত্রিপুরা রাজ্যে শুরু হয়েছিল অতি দীনভাবে উনবিংশ শতকের আটের দশকের শেষ ভাগ থেকে। ঘন জঙ্গলাবৃত, রাস্তাঘাট বিহীন ক্ষুদ্র ত্রিপুরার আর্থিক সঙগতিও সেরূপ ছিল না যে খুব ঘটা করে শুরু করে এমহৎ কাজ। কিন্তু শেষদিকের মাণিক্য রাজাদের লেখাপড়ার প্রতি প্রীতি প্রজাকুলের মধ্যে বিতরণ করতে তাঁদের উৎসাহিত করেছে এ কথা স্বীকার করতে হয়। বিশ শতকের মধ্যভাগে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে নূতন শিক্ষার পরিবৃত্তে প্রবেশ করে। রাজন্য শাসনের শেষ ষাট বৎসরের শিক্ষার অগ্রগতিই আলোচ্য গ্রন্থে আলোচনা করা হচ্ছে। আজও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সীমিত আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে যে ভাবে ত্রিপুরা রাজ্য মানবসম্পদ উন্নয়নে অগ্রসর হয়েছে তা অনেক ভারতীয় রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি সফল, অনেক বেশি উজ্জ্বল। সেজন্যই আমরা কোথায় আছি তা যেমন জানা দরকার ভবিষ্যৎ প্রগতির দৃষ্টি স্থির করার জন্য তেমনি আমরা কোথায় ছিলাম কোথা থেকে শুরু করেছি তাও জানা দরকার বর্তমানকে আরও মজবুত করার জন্য। এই প্রয়াসেই পুরানো শিক্ষা কর্মের পর্যালোচনা।

বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধগুলো রচনা করেছি। গ্রন্থকারে গাঁথতে গিয়ে কিছু অদল বদল করতে হয়েছে তথাপি নয় ক্রমের। শিক্ষক সমাজ, শিক্ষাকর্মী, ও সাধারণ পাঠকদের ভাল লাগলে পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব।

ইতি - আগরতলা

শ্রী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী।

সূচনা ঃ

মাণিক্য রাজবংশের সূচনা কাল থেকে ঊনবিংশ শতকের ছয়ের দশক অবধি ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ প্রজাদের বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান ছিল এরূপ সাক্ষ্য রাজমালা বা অন্যান্য আকর গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। ধারণা করা যেতে পারে যে যেহেতু রাজকীয় প্রশাসন বালক বালিকাদের শিক্ষার দায়িত্ব বহন করত না, সেজন্যই শিক্ষার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। পিতামাতা প্রয়োজনে বালকবালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেদের গৃহেই গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করে করতেন। অবশ্যই এই ব্যবস্থা কেবল মাত্র আলোকপ্রাপ্ত ও সচ্ছল গৃহকর্তার পক্ষেই সম্ভব ছিল। কাজে একেবারে হাতে গোনা কিছু লোক শিখতে পড়তে পারত এবং দেশের সিংহভাগ লোক নিরক্ষরতার তিমিরে ডুবেছিল। মধ্যযুগে সমসের গাজী ত্রিপুরা রাজ্যের উল্কা, বহুপ্রাচীন রাজবংশ তিনি উচ্ছেদ করেছিলেন ত্রিপুরার সিংহাসন থেকে। যদিও তাঁর অবস্থিতি ছিল অতি অল্প কালের তবু 'গাজীনামা'য় উল্লেখ রয়েছে যে তিনি বিজিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, রাজ্যের বাইরে থেকে শিক্ষিত যোগ্য শিক্ষক আনিয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের কার্যকাল নির্ধারণ করেছিলেন এবং ব্যক্তিগত ভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা ও পরিদর্শন করতেন। ১ তাঁর সমসাময়িক ত্রিপুরার রাজা যাকে তিনি বিতারণ করে রাজত্ব দখল করেছিলেন বা তার পূর্বেকার রাজাগণ এরূপ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন বলে 'গাজীনামা', ' ত্রিপুরা দেশের কথার লেখা' বা 'চম্পক বিজয়ে' উল্লেখ নেই।

তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে রাজত্ব চলত কি করে? ত্রিপুরার ইতিহাস পাঠকদের জানা আছে যে ত্রিপুরা রাজ প্রথম রত্নমাণিক্য বাংলার রাজধানী থেকে বড় খান্ডব ঘোষ, পন্ডিত রাজ এবং জয়নারায়ণ সেন নামক তিন বঙনজকে রাজ্যে এনে তাঁদের দ্বারা " মুসলমানদিনের অনুকরণে শাসনপ্রণালী ও ' পেরেস্তা' গঠন করেছিলেন। তাঁহারা ত্রিপুরেশ্বরের অত্যন্ত বিশ্বাসী বলিয়া 'বিশ্বাস' উপাধি প্রাপ্ত হন। উত্তর কালে জয়নায়ারণ সেনের বংশধরগণ চিকিৎসা ব্যবসা পরিত্যাগ পূর্বক রাজকার্যে প্রবেশ করত বিশ্বাশ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। --- ফলতঃ আদি রত্নমাণিক্যের শাসনকাল হইতে কৃষ্ণমাণিক্যের অভ্যুদয়ের পূর্বাধি ঘোষ, রাজ এবং সেন বংশীয় " বিশ্বাসগণ" একচেটিয়া ভাবে সুদীর্ঘ কাল ত্রিপুরার রাজকার্য নির্বাহ করিয়াছেন। উজীর, দেওয়ান ও সেনাপতির পদ হইতে সামান্য লেখকের কার্য উল্লিখিত তিন বংশের বংশধর দিগের একচেটিয়া ছিল। কদাচিৎ তাঁহাদের বিশেষ সম্পর্কিত (জামাতা, ভাগ্নে ও দৌহিত্র) রাজকার্যে প্রবেশ লাভ করিয়া 'বিশ্বাস' উপাধি প্রাপ্ত হতেন, কিন্তু তাঁহারা 'উপ বিশ্বাস' আখ্যা দ্বারা সর্বত্র পরিচিত ছিলেন।"? এভাবে বিশ্বাসদের দিয়ে প্রশাসনের লেখাপড়ার কাজ চলে যেত বলে রাজ্যের নিজস্ব কর্মচারী বাহিনী তৈরি করার কোন উদ্যোগ ত্রিপুরার রাজাগণ নেননি। মোহরার কাজ করতে যে সামান্য লেখাপড়া জানার দরকার হয় তার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে প্রজাদের শিক্ষিত করে রাজ কার্যের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টাও তাঁরা করেন নি।

মাণিক্যবংশের আগেকার রাজাদের, বিশেষ করে সপ্তদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত, নিজেদের শিক্ষিত ও সাক্ষর করে তোলার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা জানা যায় না। কারণ সরকারি দলিল দস্তাবেজে তাঁদের সাক্ষরের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই সমস্ত আদেশ সমূহে তাদের নিজস্ব মোহর (আজ্ঞামোহর,

পদ্মমোহর) ছেপে বা ছেটে দেয়া হত। "মহারাজ বীরচন্দ্রের সময় হইতেই, সাদা কাগজে এবং সাদা কাগজের পরিবর্তে মুদ্রিত সরকারি ফরম, লেটার হেড অথবা রাজ লাঞ্ছন (Coat of Anoms) মুদ্রণের ক্রমপ্রবর্তন দ্বারা ও প্রশাসনিক সাধারণ এবং মামুলী আদেশ পত্রাদিতে আজ্ঞা মোহরের ছাপ হ্রাস পায় এবং নৃপতিগণের স্বীয় দস্তখতই সর্বাধিক ব্যবহৃত হইতে থাকে।" ৩ কাজেই যেখানে রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রেও দস্তখত গুরুত্ব পেতো না সেক্ষেত্রে লেখাপড়া শেখার কি প্রয়োজন ছিল? সেজন্যই নিরক্ষর শাসকও আমাদের নজরে আসে। কৃষ্ণ মাণিক্যের উত্তরাধিকারী রাজধর মাণিক্য সম্বন্ধে তিনি এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে সাক্ষ্য স্বরূপ লিখেন— " রেসিডেন্ট জন বুলার সাহেবের ১৭৮৮খ্রিস্টাব্দের ১২ই আগস্টের চিঠিতে লিখিত আছে যে, রাজধর কিছুমাত্র লেখাপড়া জানিতেন না, এবং নিজের নামটিও দস্তখত করিতে পারিতেন না।" ৪ পূজা অর্চনাদিতে বা পারলৌকিক কাজে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করত, যজমান শুণে শুণে উচ্চারণ করত, ধর্ম কথা শোনাত ব্রাহ্মণ পাঠক,রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থাদি পড়তেন কথক ঠাকুর। এরূপ পরিবেশেই কাল চলে যাচ্ছিল। হাতে কলমের চাইতে রবারীই অধিকার রক্ষায় ও প্রতিষ্ঠায় বেশি জরুরী ছিল।

এই অন্ধকার যুগের অবসান ঘটে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রবেশের ফলে। ইতিপূর্বে বাংলার মুসলমান নবাবদের নিকট ত্রিপুরদের স্বাধীনতা চলে গিয়েছিল তাঁদের তরবারীর ধার কমে যাবার ফলে। এখানে মুসলমান নবাবদের উত্তরসুরী ব্রিটিশদের নিকটে তাঁদের তরবারী অলংকারে পরিণত হল কেননা কোন রাজাই ব্রিটিশের সম্মতি ভিন্ন রাজতক্তে, বসতে পারতেন না। উত্তাধিকারের ফয়সলা হত ব্রিটিশদের আদালতে এবং সেজন্যই লেখাপড়ার চর্চা শুরু করা হল বলে ধারণা করতে পারা যায়। রাজধর মাণিক্যের পরবর্তী ত্রিপুরার রাজাগণ লেখাপড়ার চর্চা করতেন। দুর্গামাণিক্য, রামগঙগা মাণিক্য, কাশীচন্দ্র মাণিক্য, কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য কেউই লেখাপড়া জানতেন না বলে সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই। দুর্গামাণিক্যের উক্তি, যা কৈলাসচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেছেন, " বলরাম বিশ্বাস আমার শিক্ষক ছিলেন,আমি তাহার নিকট সমস্ত বাল্যজীবন বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি আমার দ্বারা সেই বলরামের পুত্র রাম হরির প্রাণ দন্ড হইতে পারিবে না।"৫ প্রমাণ করে যে দুর্গামাণিক্য লেখাপড়া জানতেন। রামগঙগা মাণিক্য সম্বন্ধে কৈলাশচন্দ্রের উক্তি " তিনি পারস্য ভাষা এবং ভূমি পরিমাণ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ছিলেন; তিনি শস্ত্র ও মল্ল যুদ্ধেও বিলক্ষণ পরদর্শী ছিলেন। ৬ কৈলাসচন্দ্র কাশীচন্দ্র মাণিক্যের বিদ্যাবত্তা নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি সেজন্য মনে করা যেতে পারে তিনিও লেখাপড়া জানতেন এবং পরবর্তী ত্রিপুরা রাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য "পারশ্য ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন। শস্ত্র বিদ্যা ও মল্লযুদ্ধের সুনিপুণ ছিলেন, তন্ত্র শাস্ত্রেও তার বিশেষ ভক্তি ছিল। " ৭ গুরু বিপিন বিহারী গোস্বামীর আদেশে নিষ্কর লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করার পাট্টাতে আজ্ঞামোহর অঙ্কন করার পরে মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য একখন্ড চিঠি লিখিতে ইচ্ছা করিয়া লেখনী ধারণ করিলেন, কিন্তু লেখনী সঞ্চালন করিতে পারিলেন না, তাঁহার দক্ষিণ হস্তকম্পিত হইতে লাগিল।" ৮ এই তথ্য প্রমাণ করে যে তিনি লেখাপড়া বেশ ভালই জানতেন। ত্রিপুরার রাজাগণ রাজ্যে বিদ্যালয় না থাকলেও কি রূপে লেখাপড়া শিখতেন? ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র মহামান্যবর নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর লেখা " আবর্জনার ঝুড়িতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

তিনি জানিয়েছেন রাজবাড়ির অভ্যন্তরে রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য সমতল বঙ্গদেশ থেকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হত। তাঁর ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার জন্য রামদুলাল শর্মা বিদ্যাভূষণকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ৯ পাঠ শুরু করার পূর্বে রীতিমত পূজা ও হাতে খড়ি পর্ব সমাধা হত। এ সমস্ত পন্ডিতগণ প্রচলিত দেশীয় শিক্ষারীতি অনুযায়ী সংস্কৃত, বাংলা, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে রাজপুত্রদের তালিম দিতেন। রাজপুত্র ভিন্ন গণ্যমান্য ঠাকুর সন্তানরাও এই গৃহবিদ্যালয়ে তালিম নিতে পারত। কাজেই যে ব্যবস্থায় নবদ্বীপ চন্দ্র লেখাপড়া শিখেছিলেন সেরূপ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁর পূর্বপুরুষগণও বিদ্যালাভ করেছিলেন বলে ধারণা করলে অযৌক্তিক হবে না বলে আশা করা যেতে পারে। বীরচন্দ্র মাণিক্যের কালে দেশীয় পন্ডিতদের বাদ দিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত গৃহ শিক্ষক নিযুক্তির প্রচলন হয়। ঢাকা নিবাসী আনন্দমোহন সেন সেই শ্রেণির প্রথম শিক্ষক যিনি ত্রিপুরার রাজপুত্রদের গৃহশিক্ষকের পদে কাজ করেছিলেন। ১০ বাংলার নবাব মীরকাশিম কর্তৃক চট্টগ্রাম বিভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দেবার ফলে ঐ অঞ্চলে তাদের প্রভাব বাড়ে এবং এলাকার শিক্ষার জগতে নূতন চেতনা সঞ্চারিত হয় এবং ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানী বাংলার দেওয়ানী লাভ করার ফলে ঐ নূতন চেতনা আরও জোরদার হয়। সমতল ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। টোল, মাদ্রাসার সঙ্গে স্কুলও আস্তে আস্তে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ সাধারণের পক্ষে জীবিকা অর্জন করার জন্য ইংরেজি ভাষা ওপাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ধারা জানার প্রয়োজন দেখা দেয়। ত্রিপুরা জেলা ত্রিপুরার মহারাজাদের জমিদারীর অন্তর্গত। উত্তরাধিকার বিষয়ে মোকদ্দমা ছাড়াও অন্যান্য রাজস্ব বিষয়ক মামলা ত্রিপুরার জেলা আদালতেই নিষ্পন্ন হত। ব্রিটিশ আদালতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার তাই এসব মামলা মোকদ্দমা চালাবার জন্য ইংরেজি জানা লোকের প্রয়োজন। ফলে সমতল বঙ্গের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লোক রাজকার্যে নিযুক্তি পেতে থাকে। কিন্তু তখনও ঠাকুরলোক বা সাধারণ লোকদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার কোন চেতনা রাজ্যে দেখা দেয়নি। শতাব্দী কাল পরে বীরচন্দ্রের আমলে এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। ১৮৭১ খ্রিঃ ত্রিপুরাতে ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হয়। মিঃ এ ডব্লিও বি পাওয়ার ১৮৭১ খ্রিঃ ১লা আগস্ট আগরতলাতে পলিটিক্যাল এজেন্টের কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর রিপোর্টে জানা যায় যে, ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যে দুইটি মাত্র বিদ্যালয় ছিল। ১ টি আগরতলাতে সম্ভবতঃ ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে এবং অন্যটি কৈলাশহরে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে স্থাপন করা হয়। দুটি স্কুলই অ্যাংগলো ভারর্নাকুলার স্কুল। নবদ্বীপ চন্দ্র লিখেছেন যে তাঁর পিতৃবিয়োগের পরেই (১৮৬২খ্রিঃ) তাঁদের অভিভাবক খুড়া মহারাজ বীরচন্দ্র তাঁদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য আনন্দমোহন সেন মহাশয়কে নিয়োগ করেন। আরো লিখেছেন "আমাদের ইংরেজি অধ্যয়ণারম্ভের কিছুকাল পূর্বে তিনি একটি অবৈতনিক বঙ্গবিদ্যালয় (ব্রিটিশ ভারতের স্কুলের বিধি ব্যবস্থায় পরিচালিত সাধারণের প্রবেশ গম্য আদি বিদ্যালয়) ত্রিপুরার পাশ্চাত্য শিক্ষার genesis স্থাপন করেছিলেন।"১২ কাজেই ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় এসেই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম জনসাধারণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য।

পাদটীকা

১। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নায়ারণ ঃ সমসের গাজী, আগরতলা ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৪৯-৫০।

২। সিংহ কৈলাশচন্দ্র ঃ রাজমালা, বর্ণমালা সংস্করণ, আগরতলা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭০।

৩। দত্ত ও বন্দোপাধ্যায় ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা, আগরতলা ১৯৭৬, পৃঃ ভূমিকা ১২।

৪। সিংহ কৈলাশচন্দ্র ঃ পূর্বে উল্লিখিত , পৃঃ ১৩৬।

৫। তদেব ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৩।

৬। তদেব ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৫০।

৭) তাদের ঃ পূর্বে উল্লিখিত , পৃঃ ১৫৪।

৮) তদেব ঃ পূর্বে উল্লিখিত, পৃঃ ১৬০।

৯) গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ, অরুণ দেববর্মা সম্পাদিত ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা রচিত ঃ আবর্জনার ঝুড়ি, আগরতলা , ২০০৪, পৃঃ১৫।

১০। তদেব ঃ পূর্বে উল্লিখিত , পৃঃ ৩৫।

১১। চৌধুরী দীপক ঃ পৃঃ ৯।

১২। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ অরুণ দেববর্মা ঃ আবর্জনার ঝুড়ি, পৃঃ উ, পৃঃ ৪২।

ক্রমবিস্তার

যেহেতু রাজ্যে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন বীরচন্দ্র মাণিক্য ১৮৬২ সালে এবং মহারানি কাঞ্চন প্রভার কালে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরাতে রাজন্য শাসনের অবসান ঘটে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ফলে, আমাদের পর্যালোচনা তাই ১৮৬২-১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ৮৭বৎসরের রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের পর্যালোচনা,যার ফলে আমরা বুঝতে পারব স্বাধীন ভারতে অধিবাসী রূপে ১৯৫০ সালে আমরা কোথা থেকে শুরু করেছি এবং গত পঞ্চাশ বছরে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি।

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্থাপন অবশ্যই প্রাথমিক কাজ। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে থেকে শুরু করে ১৯৪৯ সালে ভারতভুক্তি পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য, রাধাকিশোর মাণিক্য, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ও রিজেন্ট মাতা মহারানি কাঞ্চনপ্রভাদেবীর রাজত্বকালের প্রশাসনিক বিবরণী পর্যালোচনা করে বিদ্যালয় স্থাপন ও মোট সংখ্যা নির্ণয়ের কাজ শুরু করা যেতে পারে। বীরচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৮৬২-১৮৯৬ খ্রিঃ)রাজ্যে মোট ৩৬টি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ড.গণ চৌধুরী জানিয়েছেন। ১কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের উৎস জানান নি। ১৮৯৫-৯৬ সালের প্রশাসনিক বিবরণী এখনও পাওয়া যায়নি, তাই তাঁর সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বিচার করা দুরূহ। অবশ্য ১৮৯৪-৯৫ সালের বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে সে সময়ে রাজ্যে ৩৫ টি স্কুল চালু ছিল যা আগের বছরের ২৯টির চেয়ে অনেক বেশি। ২

রাধাকিশোরের আমলে (১৮৯৬-১৯০৯ খ্রিঃ) রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্যনীয়। রাধাকিশোর নিজেও বিদ্যারসিক, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন, অপরদিকে তাঁর সুহৃদ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ও তাঁকে হিন্দু রাজার কর্তব্য রূপে বিদ্যা দান করতে প্রভাবিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সময়ে অনেক বার আগরতলা আসেন এবং বিশেষ করে উমাকান্ত একাডেমী পরিদর্শন করেন। সে সময়ে কবি নিজেও জমিদার রূপে রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগণার পতিসরে বিরাট শিক্ষা যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন সে সময়ে ঠাকুর পরিবারের ঐ জমিদারীর পরিচালক রূপে মাত্র মাসিক ৩০০ টাকা পরিশ্রমিক নিয়ে নিজ পরিবার, প্রিয়জন প্রতিপালন করে তিনি যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন তা সত্যিই বিস্ময় কর। " প্রত্যেক গ্রামে গ্রামবাসী ও জমিদারের যৌথ উদ্যোগে বসান হল একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিন বিভাগে স্থাপন করা হয় তিনটি মাইনর স্কুল এবং সদর কাছারীতে স্থাপন করা হল একটি হাইস্কুল। সেখানে ছাত্রাবাস তৈরি হল। স্কুল নির্মাণ ও ছাত্রাবাস নির্মাণের টাকা হিতৈষী সভা থেকে দেয়া সম্ভব ছিল না বলে রবীন্দ্রনাথ এস্টেট থেকে সব টাকা দিতেন। এই ভাবে স্থাপিত হয়েছিল দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়। " ৩ এই প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের রিপোর্টে দেখা যায় " There are primary schools in each division and at patisar, the center of management, there is a High school with 250 students and a charitable dispensary". ৪ রাধাকিশোর বন্ধু হিসাবে কবির প্রকল্প পরিচালনার ব্যাপার জানতেন। তাঁর সুহৃদ কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্মা ও পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর (লালু কতা) পতিসরে গিয়ে ঐ শিক্ষাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কাজেই রবীন্দ্রপ্রভাবী রাজার

উৎসাহ বৃদ্ধি পাবারই কথা। ফলে ১৯০৮-১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় রাজ্যে মোট স্কুল ছিল ১৪৪টি যার মধ্যে ১৩৫ টি বালকদের জন্য এবং ৯টি কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য। ৫ অবশ্যই বালকদের জন্য নির্দিষ্ট স্কুলে বালিকারাও পড়ত। বিদ্যালয়গুলি অবশ্যই সমতল জনপদে স্থাপিত হয়েছিল কারণ পার্বত্য অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। সেজন্যই সম্ভবতঃ রবীন্দ্র যেখানে সমতল জমিতে একটি মাত্র পরগণাতে দুই শতাধিক স্কুল স্থাপনে সমর্থ হয়েছিলেন সেখানে পার্বত্য রাজ্যের মধ্যে স্কুল স্থাপনের অগ্রগতি কিছুটা কম বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে (১৯০৯-১৯২৩ খ্রিঃ)রাজ্যে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত থাকলেও সাধারণ শিক্ষার প্রসারে এই চৌদ্দ বৎসর কাল খুব একটা সন্তোষজনক মনে হয় না। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বিবরণী অনুসারে রাজ্যে মোট স্কুলের সংখ্যা ১৫০ যার মধ্যে H.E, ME, H.V, LVএবং পাঠশালা ছিল। এখানে একটি নতুন সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। সরকারি প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারি প্রচেষ্টার মিলন কেননা মোট ১১৫টি পাঠশালার মধ্যে ১১টি ছিল প্রাইভেট। এছাড়া ৩টি টোল, ৫টি মক্তবমাদ্রাসা,১টি আর্টিজান স্কুল, ১টি রেশম শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র, ১টি কৃষি স্কুল ও১টি চিকিৎসা বিদ্যার স্কুলও সরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। ৬

বীরবিক্রম কিশোরের রাজত্ব কালে (১৯২৩-১৯৪৭ খ্রিঃ) শিক্ষার প্রসারে নানা উঠানামা লক্ষ্য করা যায়। বিদ্যালয়ের সংখ্যার এই উঠানামা নিম্নরূপঃ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯২৩ এ ১৭০, ১৯৩০ এ ১৭৭, ১৯৩৩ এ ১৮৪, ১৯৩৫ এ ১৯৪, ১৯৩৯ এ ১৪১, ১৯৪০ এ ১৫০, ১৯৪১ এ ১৫০, ১৯৪২ এ ১৫০ এবং ১৯৪৭ এ ২৫০। ৭ এর মধ্যে ১৯৩৯ সালের সংখ্যটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কারণ তা তাঁর পিতামহের আমলের সংখ্যার চেয়ে কম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে উদ্ভব নানারূপ প্রতিকূলতার জন্য বহু স্কুল বন্ধ হয়ে গেল বা নূতন স্কুল স্থাপনে আর্থিক বন্ধনের সুযোগ ছিল না যেজন্য ১৯৪০, ১৯৪১ এবং ১৯৪২ এর স্কুল সংখ্যা একই দেখা যাচ্ছে। আরও একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়। ১৯৪৬ সালে রাজ্যে মোট স্কুল ছিল ১২৩টি প্রাইমারী/ এম.ই এবং ৯টি হাইস্কুল। ৮ এখানেও দেখছি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা পূর্ববর্তী কালের তুলনায় একেবারে নীচে নেমে এসেছে। সেক্ষেত্রে মাত্র এক বছর পরে ১৯৪৭ সালে তা ২৫০ হল কিভাবে? পূর্বোক্ত ১২৩টি স্কুলের মধ্যে ৪টি স্কুল ছিল যেখানে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প চালু হয়েছিল।

এরূপ বিদ্যালয় সংখ্যার হঠাৎ বৃদ্ধির কারণ রূপে বলা যায় যে উহা 'জন শিক্ষা সমিতি'র আন্দোলনের ফল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে ডিসেম্বর (১৩৩৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ই পৌষ) তারিখে দুর্গাচৌধুরী পাড়াতে উপজাতি যুব সম্মেলনে 'জন শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ঐ সময়ে জন শিক্ষা সমিতি দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে বহু প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করে। স্কুলের সংখ্যা কত ছিল তা নিয়ে অবশ্যই নানারকম মত প্রচলিত আছে। যেমন 'এভাবে জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের ও কর্মীদের সোৎসাহে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে ৪৫০টি স্কুলের তালিকা তৈরি করে, তৎকালিন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে স্কুলগুলির সরকারি মঞ্জুরী প্রার্থনা করা হয়। মহারাজা নেতৃবৃন্দের কথা আগ্রহ সহকারে শোনেন ও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিধাহীন ভাবে তালিকাভুক্ত স্কুলগুলির মঞ্জুরীর আদেশ

দেন। " ৯ " জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৪৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে তিনশয়ের বেশি বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন লাভ করে সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল। " ১০ জনশিক্ষা আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই আন্দোলনের পেছনে অর্থের জোগান বিশেষ কিছুই ছিল না, কিন্তু লোকবলে তাঁরা বলীয়ান ছিলেনা। ফলে দু'তিন বছরের চেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮৪টি; এর মধ্যে ৩০০টি বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি অনুদান পাওয়া যায়।" ১১ সে সময়ে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ছিলেন ব্রাউন সাহেব। তাঁর আনুকুল্যে নিশ্চয়ই কিছু সংখ্যক স্কুল সরকারি স্কুলে পরিণত হয়েছিল। সেজন্যই ১৯৪৭ সালে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০ এ যেখানে ১৯৪৬ সালে ছিল ১২৩টি। ৩০০ স্কুল নিশ্চয়ই অনুমোদন পায়নি এ কথা বলা যেতে পারে। যদি পেত তাহলে মহারাণির ঘোষণায় স্কুলের সংখ্যা ৪২৩ লিখিত হত।

পাদটীকাঃ

১। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ ত্রিপুরার ইতিহাস, আগরতলা, ২০০০ইং, পৃঃ ১৫৭।

২। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ, অরুণ দেববর্মা ঃ The Administration Reports of Tripura State, Agartala 2004, P.41.

৩। আহমদ রফিক ঃ রবীন্দ্র ভুবনে পতিসর, ঢাকা , ১৪০৫, পৃঃ ২৩।

৪। Rajsahi District Gazether, 1916.

৫। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ রাধাকিশোর মাণিক্য, আগরতলা ২০০৫, পৃঃ ২৬।

৬। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা প্রসঙ্গ বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য, আগরতলা ২০০২, পৃঃ ২৬।

৭। গণচৌধুরী জগদীশ ঃ পূঃ উঃ পৃঃ ১৭৫, ১৭৬,১৭৯, ১৮২,১৮৯,১৯১,১৯৪ এবং ১৯৬ ও ২৩২।

৮। মেনন কে.ডি ঃ ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার অব ত্রিপুরা ৩১৬, ৩১৭।

৯। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব ঃ পটভূমিকা আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি সংগঠক ও সমসাময়িকদের মূল্যায়ন, আগরতলা ১৯৯৬, পৃঃ ৩৩।

১০। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব ঃ তদেব, পৃঃ ৩৫।

১১। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শুভব্রত দেব ঃ তদেব, পৃঃ ৭২।

শিক্ষা প্রশাসন

সূচনাতে রাজ্যে শিক্ষা বিভাগ আলাদা দপ্তর হিসেবে গড়ে উঠেনি। একজন দেওয়ান অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে শিক্ষার ব্যাপারটি দেখাশোনা করতেন। ১ ডিবিশানগুলিতে ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের অফিসে অন্যান্য কাজের সঙ্গে একজন মোহরার শিক্ষা বিভাগের চিঠিপত্র আদেশ পত্রাদি রক্ষণাবেক্ষণ করতেন এবং

উপরের স্তরের সঙ্গে বিভাগের নীচের যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক উমাকান্ত, নতুন হাবেলী সিড্‌ল স্কুল ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় বছরে দুইবার পরিদর্শন করতেন। কৈলাশহরে ও বিলোনীয়া স্কুল বছরে একবার পরিদর্শন করতেন। বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক বা তার হয়ে সেকেন্ড অফিসার বিভাগের স্কুলগুলির পরিদর্শনের দায়িত্বে ছিলেন। ঐ সময়ে স্কুল পরিদর্শনের জন্য বিশেষ ভাবে নিযুক্ত, করা হয় একজন সুপারভাইজার। ২ তিনি রাজ্যের সমস্ত মধ্যইংরেজী , উচ্চবাংলা , নিম্নবাংলা এবং পাঠশালা পরিদর্শন করবেন বলে স্থির করা হয়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের সুপারভাইজারের পদ এ কালিশ করে সাব ইনস্‌পেক্টারের পদ সৃষ্টি করা হয়। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে হাইস্কুলের ক্লাস নাইন পাশ সঙ্গে পার্বত্য ভাষায় আবশ্যিক দক্ষতা স্থির করা হয়। মাসিক বেতন নির্ধারিত সকল প্রকারের ভাতা সহ মোট ৪৫ টাকা। ব্যক্তি নিযুক্ত করে তার উপর রাজ্যের সমস্ত স্কুল পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দেখা যায় উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষককে এক্স অফিসিও ইনসপেক্টার পদে নিয়োগ করে কৈলাশহরের রাধাকিশোর ও বিলোনীয়ার ব্রজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশান বছরে দুইবার এবং উদয়পুরের মধ্য ইংরেজি স্কুল বছরে অন্তত একবার পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। ৩ ঐ সময়ে একটি ডেপুটি ইনস্‌পেক্টারের পদ সৃষ্টি করে ব্যক্তি নিয়োগ করা হয় যার কাজ নির্দিষ্ট করা হয় মধ্যইংরেজী, উচ্চবাংলা, নিম্নবাংলা স্কুল পরিদর্শন করা এবং যাতায়াতের পথে অবস্থিত পাঠশালা ও তার কর্মপরিধি মধ্যে আনা হয়। এই নিয়োগের ফলে সাব ইনসপেক্টারের কাজ হয়ে দাঁড়ায় রাজ্যের সমস্ত পাঠশালা পরিদর্শন করা।

১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা স্টেট সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন করে একটি ইনসপেক্টার অব স্কুল পদ সৃষ্টি করা হয়। ৪ কিন্তু ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ডেপুটি ইনসপেক্টারের পদ এবালিশ করা হয় এবং দুইজন সাবইনসপেক্টার নিযুক্তির ব্যবস্থা করে তাদের কার্যের এলাকা ও সদর নির্ধারণ করা হয়। রাজ্যকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে ইনসপেক্টারের হেডকোয়ার্টার সদর ও সাবইসপেক্টারদের হেডকোয়ার্টার কৈলাসহর, ধর্মনগর, খোয়াই, কল্যাণপুর বিভাগ নিয়ে উত্তর সার্কেল এবং সোনামুড়া, বিলোনীয়া, সাব্রুম, উদয়পুর ও অমরপুর বিভাগ নিয়ে দক্ষিণ সার্কেল গঠন করা হয়। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত স্কুলগুলি পরিদর্শন করার জন্য একজন অতিরিক্ত হিল সাব ইনসপেক্টার অব স্কুল নিয়োগ করা হয়। তাকে খোয়াই ও সদর বিভাগের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শনের ভার ন্যস্ত করা হয়। ৬ ১৩.৮.৪১ ইং তারিখে শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের লকব পরিবর্তন করে ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসান করা হয়। ৭ ১৯৪৫ ইং সনের শেষদিকে মন্ত্রীকে সহায়তা করার জন্য চিফ ইনসপেক্টার অব স্কুল পদের সৃষ্টি করা হয় এবং ৮.২.১৯৪৯ ইং তারিখে ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনা কে মন্ত্রীর অধীনস্থ সেক্রেটারীর কার্য করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে ডি.পি.আই ওসেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয়। ৯ তাহলে রাজসরকারের শিক্ষাপ্রশাসনের কাঠামো , ভারতভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত হচ্ছেঃ মন্ত্রী- সেক্রেটারী-ডি.পি.আই চীফ ইনস্‌পেক্টার -ইনস্‌পেক্টার-সাব ইনস্‌পেক্টার তিনজন অর্থাৎ মোট ছয়জন শিক্ষা অফিসার শিক্ষা

বিভাগের কর্ম সম্পাদন করতেন।

আধিকারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ সাবইনসপেক্টার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও বিশেষ পার্বত্য বিদ্যালয় সাবইনসপেক্টারের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার চাহিদা দেখা যায় ম্যাট্রিকুলেশান পাশ বা হাইস্কুলের নবম শ্রেণী উত্তীর্ণ এবং পার্বত্য ভাষাভিজ্ঞতা। সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে যে সাধারণ সাব ইনসপেক্টারদেরও ন্যূনতম যোগ্যতা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ নির্ধারিত ছিল। ইনসপেক্টার যেহেতু স্টেট সিভিল সার্ভিসভুক্ত কর্মচারী সেজন্য তার ন্যূনতম যোগ্যতা " কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ বা তদূর্দ্ধ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ" আবশ্যিক ছিল।

আধিকারিকদের বেতনক্রম ঃ সাবইনসপেক্টার পদের মাসিক বেতন প্রচলিত ভাতাদিসহ ৪৫ টাকা নির্দিষ্ট ছিল। ডেপুটি ইনসপেক্টারের বেতন ক্রম ৫০-৫-৭৫টাকা। দেখা যায় এবং বিশেষ পার্বত্য বিদ্যালয় সাবইনসপেক্টারের বেতন ২৫ টাকা। (১৫+ ১০) দেখা যায়। রাজ্য সিভিল সার্ভিসে ৪টি গ্রেড ছিল। প্রথম শ্রেণি ২৫০-১০-৩০০ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৫০-১০-২৫০ টাকা, ৩য় শ্রেণি ছিল। সার্ভিসে পদসংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ১০টি, তৃতীয় শ্রেণিতে ১০টি এবং চতুর্থশ্রেণিতে ১৫টি পদ। কিন্তু উমাকান্ত স্কুলের হেড মাস্টারের বেতন ক্রম দেখা যায় ১০০-৫-২০০ টাকা, সেজন্য অনুমান করা যেতে পারে যে ইনসপেক্টারও ঐ বেতন ক্রম ভোগ করতেন।

ইনসপেক্টারের কার্যাবলি ঃ নিয়মানুযায়ী বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যতীত নিম্নলিখিত কার্যাবলিও ইনসপেক্টারের উপরে ন্যস্ত ছিল। ক) রাজ্যে শিক্ষার উন্নতি সাধনে প্রস্তাবাদি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকটে পেশ করা, খ) বিদ্যালয় সমূহের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা, গ) মধ্য ইংরেজী, উচ্চ বাংলা, নিম্ন বাংলা ও পাঠশালা সমূহের বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা ও পরিচালনা করা, ঘ) রাধা কিশোর ইনষ্টিটিউশান এবং ব্রজেন্দ্রকুমার ইনস্টিটিউশানের নবম এবং দশম শ্রেণির পরীক্ষার ব্যবস্থা ও গ্রহণ করা, ঙ) সাব ইনসপেক্টারদের কার্য তদারক করা, চ) কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে কার্যের বিবরণী যথারীতি পেশ করা এবং বছরে দুইবার হাইস্কুল সমূহ পরিদর্শন করা, হাইস্কুলের ৫মাইল বৃত্তের মধ্যে অন্যান্য স্কুল পরিদর্শন করা, হিসাব পত্র পরীক্ষা করা এবং অভিভাবক এবং অন্য সরকারি কর্মচারীদের মতামত সংগ্রহ করা প্রভৃতি। বিদ্যালয় পরিদর্শনান্তে ইনসপেক্টার বিদ্যালয় ২ দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

চিফ ইনসপেক্টারের কার্যাবলি ঃ তার নিম্নপদস্থ সকল কর্মচারীর আকস্মিক বিদায় মঞ্জুর করা, বেতন এবং অন্যান্য খরচের বিলসমূহ পাশ করা ও প্রত্যায়িত করা, ২০ টাকা পর্যন্ত খরচের মঞ্জুরী প্রদান করা এবং ২০-২-৪০ টাকা পর্যন্ত বেতনক্রমের সকল শিক্ষকের নিযুক্তি ও বদলি করা।

এছাড়া কিছু সংখ্যক বিশেষ অতিথিদের দিয়েও বিদ্যালয় পরিদর্শন করান হত বিশেষ করে উমাকান্ত স্কুলের ঠাকুর বোর্ডিং। দেখা যায় রাধাকিশোরের রাজত্বকালে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দিয়ে ঠাকুর বোর্ডিং পরিদর্শন করান হয়। আরও যাদের নিয়ে ঠাকুর বোডিং পরিদর্শন করান হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নাটোরের মহারাজা, চট্টগ্রাম বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং বাংলার লেফট্যানেন্ট গভর্নর প্রমুখ।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে ধারণা করা যেতে পারে যে রাজ্যেরে ভৌগোলিক বিস্তৃতি, লোকসংখ্যা, বিদ্যালয় সমূহের অবস্থান প্রভৃতি বিবেচনা করলে সেকালের রাজ্যের শিক্ষা প্রশাসন খুবই সবল ছিল না এবং এ ব্যাপারে রাজ্যের আর্থিক ক্ষমতাও অবশ্যই বিচার্য বিষয় বলে ধরে নিতে হবে।

পাদটীকা ঃ

১। ১৩২৪ ত্রিং ১৩ই পৌষের আদেশ দ্রষ্ট্রব্য (পৃঃ ৫৭ গেজেট সংকলন)

২) ১৩২৫ ত্রিং ১২ই আশ্বিন তারিখের আদেশে ঐ লকব বন্ধ করা হয় (পৃঃ ৬৫ গেজেট সংকলন)

৩। ১৩২৫ ত্রিং ৮ই আশ্বিনের আদেশ (পৃঃ ৬৬ গেজেট সংকলন)

৪। ১৩২৫ ত্রিং ৮ই আশ্বিনের আদেশ (পৃঃ ৬৯ গেজেট সংকলন)

১৩২৬ ত্রিং পদসংখ্যা১৭ (পৃঃ ৭১ গেজেট সংকলন)

৫।১৩৩৫ ত্রিং আদেশ সংখ্যা২৩৮৩ (পৃঃ ১৮৭ গেজেট সংকলন)

৬। গেজেট সংকলন, পূ.উ পৃঃ ১৮৮।

৭) ঐঃ পৃঃ ২২১।

৮) ঐঃ পৃঃ ২২৬।

৯) ঐঃ পৃঃ ২৩৫।

প্রাথমিক শিক্ষা

" এই রাজ্যের প্রজাসংখ্যর তুলনায় বিদ্যালয় ও ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত কম। রাজধানী ব্যতীত এ রাজ্যের সর্বত্রই নিম্নশ্রেণির লোকের বাস। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহাদের অধিক নয়। তাহাদের অবস্থাও অভাব অনুসারে সুপ্রণালীমতে গঠিত পাঠশালার শিক্ষাই প্রচুর হইবার কথা। অতত্রব উপযুক্ত প্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠশালা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। " ১.এই মতে কাজ শুরু করলেও পরে দেখা গেল আশানুরূপ সাফল্য আসছে না বরং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়লেও ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এ রাজ্যের অনেক স্থানের প্রজাই বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে এত উদাসীন যে তথাকার পাঠশালার শিক্ষকগণ তাহাদিগকে অনেক বুঝাইয়াও ছাত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় না। এ রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাজকর্মচারী মাত্রেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া সঙ্গত। যে যে স্থানে বিদ্যালয় অবস্থিত তথাকার দারোগা বা নায়েব বিদ্যালয়ের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। ২ উনিশ শতকের শেষ দিকে প্রকাশিত বঙ্গীয় প্রশাসনিক বিবরণীগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার গতি শ্লথের কারণ হিসাবে আনুপযুক্ত স্থানে স্কুল নির্মাণ বা স্থাপন, উপযুক্ত পরিদর্শন ও তদারককারীর অভাব, শিক্ষকদের সময়মত বেতন প্রদানের অনিশ্চয়তা, জনগণকে আর্থিক সাহায্য প্রদান না করা প্রভৃতির কথা উল্লেখ থাকলেও রাজ সরকার শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিল তার কোন উল্লেখ বিশেষ নেই। কিন্তু রাজ সরকার কি ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসার জন্য কোন প্রকার উৎসাহ দেয়নি? এই প্রবন্ধে রাজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহ

সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনার প্রাককালে আমাদের জানা প্রয়োজন যে ১৯৪৯ সালের পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্যে হাইস্কুল , এম.ই.স্কুল ,উচ্চবাংলা স্কুল, নিম্নবাংলা স্কুল ও পাঠশালা নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। "এই গুলির মধ্যে উচ্চবাংলা, নিম্নবাংলা, পাঠশালা প্রাইমারী স্কুল নামে অভিহিত হলেও প্রাইমারী স্কুলের অধিকাংশই ছিল পাঠশালার পর্যায়ভুক্ত।"৩ মহারাণির ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬সালে রাজ্যে ২৫০টি প্রাইমারী স্কুল ছিল। ১৩৫৫ ত্রিং (১৯৪৬ইং) সনের প্রশাসনিক বিবরণী অনুযায়ী রাজ্যে পাঠশালা ছিল ৮৬টি, নিম্নবাংলাস্কুল ৩২টি অর্থাৎ প্রাইমারী স্কুলের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮টি। ৪এই সময়ে রাজ্যে এম.ই.স্কুল ছিল২২টি এবং হাইস্কুল ৯টি। এই স্কুলগুলিতেও প্রাথমিক শ্রেণি ছিল। কারণ ১৯৪৬ ইং সনে ৯টি হাইস্কুল থেকে মোট ১২০ জন ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায়বসে অর্থাৎ গড়ে ১৫জন ছাত্র প্রতি স্কুল থেকে আসে। ৪ স্কুলগুলির মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ২৯৩৭ জন অর্থাৎ প্রতিস্কুলে গড়ে ৩২৫ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। এই ৩০০ শতের বেশি পড়ুয়া শুধু মাত্র সপ্তম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত হতে পারেন। কাজেই মহারানির ঘোষণার মধ্যে মোট স্কুলের সংখ্যাতে হাইস্কুল ও এম.ই স্কুলও ধরা হয়েছিল । এসব মিলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৮+ ৩১= ১৪৯ তে। তবু ২৫০ হচ্ছে না। ১৩৫৫ ত্রিং সনের বিবরণীতে প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দেখানো হয়েছে ৪৩টি। ৫ এগুলি সরকারি অনুদান পেত না। এই সংখ্যাটি যোগ করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯২ তে। বাকি ৫৮টি কোথায় গেল? এই সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। ১৯৪৬ সালের বিবরণীতে রাজ্যের মোট ছাত্রসংখ্যা দেখান হয়েছে ১০০০১ জন। ৬ ১৮৬২ সাল থেকে শুরু করে প্রথমে রাজধানীতে এবং ক্রমে কৈলাশহর ও অন্যান্য বিভাগের সদর কার্যালয়ের চার পাশের সমতল ভূমিতেই স্কুলগুলি স্থাপন করা হয়েছিল। যে ভাবে সংখ্যা বেড়েছে বীরচন্দ্র থেকে বীরবিক্রম পর্যন্ত তা হচ্ছে যথাক্রমে ৩৪, ১৪৪, ১৩৪, ২৫০ টি। এর মধ্যে বীরেন্দ্র কিশোরের আমল পর্যন্ত রাজ্যের অভ্যন্তরে পার্বত্য অঞ্চলে রাস্তা ঘাটের অভাবে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। যদিও রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রাইভেট স্কুলের অস্তিত্ব ছিল। বীর বিক্রমের আমলে জনশিক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভ্যন্তরের স্কুলগুলির মধ্যে অনেক স্কুল সরকারি স্বীকৃতি পাবার ফলে রাজ্যের মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৫০-এ এলেও ১৩৫৫ ত্রিং অর্থাৎ ১৯৪৬ সালেও ৪৩টি প্রাইভেট স্কুলে ৪৭৫১ ছাত্রছাত্রীর অস্তিত্ব প্রশাসনিক বিবরণীও স্বীকার করে নিয়েছে।৭

বেতন ও ভর্তি ফিস ঃ ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করার ফিস আদায় রাজ্যে প্রচলিত ছিল না। ১৮৬২ সালে রাজ্যে প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় ৭০ বৎসর পরে ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফিস আদায় ও মাসিক বেতন নেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে ভর্ত্তির ফিস ও বেতন না নেবার ফলে বহু ছাত্রই নিয়মিত স্কুলে আসত না। দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির ফেলে তাদের নাম রেজিস্টারী হতে কাটা হত। এতে শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতা প্রকাশ পায়। এজন্য কর্তৃপক্ষ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের ১নং সারকুলার অনুযায়ী নিয়ম করে যে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে (শিশুশ্রেণি) Infant Class Section A and B and class I and II এর জন্য স্কুলে ভর্তি হবার সময়। আটআনা ভর্ত্তির ফিস দিতে হবে এবং কোন কারণে নাম কাটা গেলে পুনরায়

ভর্ত্তির ফিস না দিলে নাম রেজিস্ট্রিভুক্ত করা হবে না। প্রত্যেক ছাত্রকে মাসে চার আনা হিসাবে বেতন দিতে হবে। বিদ্যালয়ে অনুপিস্থিতির জন্য হাইস্কুলের নিয়ম মত জরিমানা দিতে হবে।" কিন্তু ত্রিপুরা, মণিপুরী, ঠাকুরলোক ও রাজকুমার সম্প্রদায়ের ছাত্রগণকে উপরোক্ত নির্দ্ধারিত হারে বেতন দিতে হইবে না। ৮

কিন্তু একবৎসর পরে ১৩৪২ ত্রিং সনের ১নং সারকুলার থেকে জানা যায় যে-"রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের নিকট হইতে কোন ভর্ত্তি ফিস গ্রহণের নিয়ম না থাকায় অনেক ছাত্র যথেচ্ছ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হয় এবং বিনা কারণে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যায়।... পাঠশালা ও নিম্ন বাংলা স্কুলে ভর্ত্তি হইবার সময় প্রত্যেক ছাত্রকে ভর্ত্তি ফিস বাবত ১ আনা দিতে হইবে... একবার রেজিস্ট্রি হইতে কাহারও নাম কর্ত্তন করা হইলে পুনরায় ভর্তির ফিস গ্রহণ ব্যতীত তাহার নাম রেজিস্ট্রি ভুক্ত হইতে পারিবে না।"৯

এই আদেশের ফলে সারা রাজ্যের পাঠশালা ও নিম্নবাংলা স্কুল সমূহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা কমতে থাকে, নূতন ভর্তির সংখ্যাও কমে যায়। ফলে চিন্তাগ্রস্ত রাজসরকার পুনরায় ১৩৪৩ ত্রিং সালের সংপৃষ্ট শিশু শ্রেণিগুলির Infant Class Section A and B and class I and II ছাত্রগণের ভর্তি ফিস ও বেতন বাবত দেওয়ার বিষয়ে এ বিভাগের ৭/১/৪১ ত্রিং তারিখের ১নং সারকুলার দ্বারা বিধান করা হইয়াছিল। উক্ত শ্রেণিগুলিতে ছাত্র বেতন প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস হেতু ... আদায়ের প্রথা রহিতের প্রস্তাব করিয়াছেন। অতএব এ বিভাগের ৭/১/৪১ ত্রিং তারিখের ১নং সারকুলারের .... ছাত্রগণের নিকট হইতে বেতন আদায়ের বিধান এতদ্বারা রহিত করা যায়।" ১০

কিন্তু ভর্ত্তি ফিস ও অনুপস্থিতির জরিমানার নির্দেশ বহাল থাকে। হাইস্কুলগুলি রাজ্যের বিভাগীয় সদর দপ্তরে অবস্থিত। কাজেই সেখানে রাজকর্মচারীসহ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ও সচেতন লোকের বাস বলে ধারণা করা যায়। সেখানেই যদি বেতন দিতে অনিচ্ছুক অভিভাবক শিশুদের স্কুলে পাঠান বন্ধ করে দিয়ে থাকেন তাহলে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ পার্বত্য এলাকার অবস্থা অনুমান করা যায়। কিন্তু রাজ্যের সেইসব স্কুলে বেতন রহিত করার কোন আদেশ পাওয়া যায় না। তবে আশা করা যেতে পারে যে হাইস্কুলেরর শিশু শ্রেণি গলিতে বেতনরহিত প্রথা নিশ্চয়ই অন্যান্য স্কুলেও আচরিত হয়েছিল।

শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন ঃ শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষা বিস্তারের কাজে রাজসরকারের প্রথম আদেশ সম্ভবত আমার দৃষ্টিতে পড়েছে, তা হচ্ছে ১৩০০ ত্রিপুরাব্দের ২৩শে আষাঢ় তারিখের হস্তলিখিত সারকুলার " সদর মোকামে ও প্রত্যেক মহকুমায় এক একটি শিক্ষা সমিতি গঠন করিতে হইবে। শিক্ষার বিস্তার ও উৎকর্ষ সাধন কল্পে সমিতির মনোযোগ ও সহানুভূতি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহাদের অভিমত লইয়া মন্ত্রী অফিসের মঞ্জুরীর জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি ম্য জিস্ট্রেটগণ পাঠ্যপুস্তকাদি নির্বাচন ও শিক্ষকাদি মনোনয়ন প্রভৃতি আবশ্যিক কার্য সম্পন্নপূর্বক রিপোর্ট করিবেন। তাহারা সমিতিতে সেক্রেটারীর কার্য করিতে পারিবেন। নূতন হাবেলীস্থ বিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র বিশেষ বন্দোবস্ত থাকিবে।" ১১ প্রাকৃতিক কারণে সামন্ততান্ত্রিক ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমদিকে বিদ্যালয় স্থাপন ও শিক্ষক

নিয়োগে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে পাঠশালা আছে বা নূতন পাঠশালা খোলা হবে সেখানকার জনসাধারণ তাদের শিক্ষকদের মনোনয়ন করে বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারকের কাছে নামগুলি পাঠাতেন। কার্যকারক মনোনীত প্রার্থীদের মধ্য থেকে শিক্ষক নির্বাচন করতেন।[১২] তারপরে অবশ্য মন্ত্রীর মঞ্জুরীর প্রশ্ন।

শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল ' বোধোদয়' নামক পুস্তক পড়তে পারা এবং পরে বুঝতে পারা কেননা তাদের তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যক্রমে বালকদের কৃষিবিদ্যা ও স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞান দিতে হত। এভাবে কতদিন চলেছিল সাক্ষ্যের অভাবে তা জানা যাচ্ছে না। তবে ১৩৩০ ত্রিং সনের ৮ই ভাদ্র তারিখের নিয়োগ আহ্বানপত্রে লিখিত হয়েছে " মেটিকুলেশান পরীক্ষোত্তীর্ণ স্থানীয় লোকের দাবী অগ্রগন্য হইবে। ১৩ এই বিজ্ঞপ্তিতে মনে হয় সাধারণ যোগ্যতা ম্যাট্রিক পাশই কাম্য ছিল। শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যাপারে পরিস্কার নির্দেশ দেখা দেয়, ৭ই জুলাই ১৯২৯ সনের বিজ্ঞাপনে যেখানে প্রার্থীকেই অবশ্যই মেট্রিকুলেট অথবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাইমারী শিক্ষক হতে হবে। সেক্ষেত্রে নির্বাচিত মেট্রিকুলেটদের নিয়োগের পূর্বে কুমিল্লাতে অবস্থিত এক বৎসরের গুরু ট্রেনিং অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। রাজসরকার প্রদত্ত মাসিক ১০ টাকা হারে বৃত্তি ভোগ করে।[১৪]

১৩১৪ ত্রিং সনের ১৮ই ফাল্গুন ৫৫নং মেমো দ্বারা জানা যায় যে চাকলা রোশনাবাদে পাঠশালার শিক্ষকদের বেতন ছিল মাসিক ৫টাকা।[১৫] কিন্তু রাজ্যে ঐ শিক্ষকদের বেতন কত ছিল সে সময়ে আমরা জানতে পারছি না সাক্ষ্যের অভাবে। ১৩৩০ ত্রিং সেনর ৮ই ভাদ্র তারিখে জম্পুই পাহাড়ে লুসাই রাজার বাড়িতে অবস্থিত পাঠশালার জন্য শিক্ষক নিযুক্তির বিজ্ঞাপনে বেতন বলা হয়েছে মাসে ২০ টাকা।[১৬] এই বেতন অন্য স্কুলে নিযুক্ত শিক্ষক পেত না, দুর্গম স্থানে বলেই ঐ স্কুল বিশেষ সুবিধা ভোগ করত । ১৯২৯ সনের বিজ্ঞাপনে বেতন দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমতল এলাকায় অবস্থিত স্কুলের জন্য ৮-½-১২ টাকা এবং পাবর্ত্য এলাকায় অবস্থিত স্কুলের জন্য ১০-½-১৫ টাকা।[১৭] তারপরের কোন সংবাদ আমাদের জানা নেই।

পাঠ্যসূচি ঃ প্রথমিক বিদ্যালয়গুলিতে কোন কোন বিষয় এবং বিষয়ের কোন কোন অংশ বিভিন্ন শ্রেণিতে পড়ান হত এবং কীভাবে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন করে উপরের শ্রেণিতে উন্নীত করা হত সে বিষয়ে বিস্তারিত সাক্ষ্যের অভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে ত্রিপুরার প্রবীণ নাগরিক শ্রদ্ধেয় জিতেন পাল মহাশয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক, সাব ইন্সপেক্টার এবং শেষপর্যন্ত বিজয়কুমার এস.ই স্কুলের হেডমাস্টার পদে তাঁর মতে সে সময়ে বিদ্যালয়ের ধরন ছিল-পাঠশালা- নিম্নবাংলা - উচ্চবাংলা এম.ই এবং হাইস্কুল। উচ্চবাংলা পর্যায়ের স্কুলগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হত। পঞ্চম ও ষষ্ঠশ্রেণিভুক্ত বিদ্যালয় এম.ই পর্যায়ের এবং হাইস্কুল ৭ম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার উপযোগী করে তোলা হত। পাঠশালা দিয়ে শুরু কিন্তু ভর্ত্তির কোন নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা ছিল না। এই Infant শ্রেণিটির ব্যপ্তি ছিল ১ বৎসর। Infant এ কী করান হত বা পড়ান হত তা তাঁর মনে নেই। তবে প্রথম শ্রেণিতে ঃ বর্ণপরিচয়, সংখ্যা পরিচয় ১-১০০ পর্যন্ত, ধারাপাত ও হস্তলিপি পাঠ্য বিষয়বস্তু ছিল। বার্ষিক পরীক্ষা হত মৌখিক কিন্তু

অকৃতকার্য হলেও পার্বত্য জাতির ছাত্রদের শ্রেণি উন্নয়ন হত।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ইংরেজী Alphabet পরিচয়, বাংলা গদ্য ও পদ্যপাঠ বিষয়বস্তুতে ছিল। অংক যোগ, বিয়োগ পর্যন্ত শেখান হত এবং হস্তলিপি অবশ্যপাঠ্য ছিল। ইংরেজি, অঙ্ক ও বাংলাতে প্রতি বিষয়ে ১০০ নম্বর ধরে মৌখিক পরীক্ষা হত। তৃতীয় শ্রেণিতে মোট ৪০০ নম্বর, বাংলা গদ্য ও পদ্যপাঠ ১০০ নম্বর, গণিত যোগ বিযোগের সঙ্গে গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়া -১০০ নম্বর, শারীরিক স্বাস্থ্যবিধি ও হস্তলিপি -১০০ নম্বর। পরীক্ষা ত্রৈমাসিক ষান্মাসিক ও বার্ষিক লিখিত পরীক্ষা হত। পাশ না করলে শ্রেণি উন্নয়ন হত না। চতুর্থ শ্রেণীতে বাংলা গদ্য ও পদ্য পাঠ, ১০০ নম্বর, অঙ্ক - মিশ্র যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ল.সা.গু, গ.সা.গু, সময়ের অঙ্ক-১০০ নম্বর; ইংরেজী - Story, Poem, Rhyme ১০০ নম্বর, স্বাস্থ্য শিক্ষা (Puronal hygine) ৫০ নম্বর, ভূগোল-ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা, সাবডিভিশন, ডিভিশন, পাহাড়, নদী নালা ইত্যাদি- ৫০ নম্বর, ইতিহাস, রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ, মহিম কর্ণেল, বীরচন্দ্রের জীবনী এবং ভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর রাজমালা- ৫০ নম্বর। মোট ৪৫০ নম্বরের বার্ষিক পরীক্ষা হত। অবশ্য ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিকও বাদ যেত না। বিদ্যালয়ের প্রথম স্থানাধিকারীকে রাজ্য বৃত্তি পরীক্ষায় বসবার সুযোগ দেওয়া হত।

এ তথ্য রাজ আমলের শেষদিকের কিন্তু পূর্বে কি ছিল আমরা জানতে পারছি না। একটি মাত্র দলিলের সন্ধানে পাই।১২৯৪ ত্রিপুরাব্দের (১৮৮৪ খ্রিঃ) ১৭ই ফাল্গুন তারিখের স্বাধীন ত্রিপুরার বিদ্যালয় সমূহের ১২৯৪ সনের ত্রিপুরার পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 'ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ' ১৭ ই ফাল্গুন ১২৯০ বাংলা সনে প্রকাশিত হয়। উহাতে প্রথম শ্রেণি থেকে শুরু করে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পঠিতব্য পাঠ্যপুস্তকের নাম রয়েছে। সে কালের রীতি অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণি হচ্ছে আজকাল কার চতুর্থ শ্রেণি। এতে লেখা হয়েছে " শিশু শিক্ষা তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম ভাগ, অঙ্কপাত, কড়াকিয়া ইত্যাদি।' [১৮] নীচে সাক্ষর কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধায়ক। এই পরিবেশন অতি সংক্ষিপ্ত, উহা থেকে পাঠ্যসূচি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায় না। অপরদিকে ১৮৮৪ সালে রাজ্যের কয়েকটি স্কুলের নাম পাই। এগুলি হচ্ছে রাজধানী পুরাতন হাবেলী, আগরতলা, কৈলাসহর, যুবরাজ স্কুল, সোনামুড়া স্কুল এবং কলুবাড়ি স্কুল, দুর্গাপ্রসাদ স্কুল অর্থাৎ মোট ৭টি। পাঠশালায় সাহায্য রাজ্যে নূতন পাঠশালা স্থাপন করলে,পাঠগুলিকে মাসিক অর্থ সাহায্য করা হত রীতিমত নিয়মানুসারে চালাবার জন্য। ১৩৩৬ ত্রিং সনের ২১ শে কার্তিক তারিখের ১৮৩৭ নম্বর মেমোতে জানা যায় যে এই ব্যাপারে সর্বাধিক মাসিক ৮ টাকা এবং সর্বনিম্ন মাসিক ৬ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। ১৯ এই মেমোর তালিকাতে কলই রাং খল, হাকর সর্বং পাটাবিল, লেম্বুছড়া, খামারহাটি, কালিকাপুর, ইটাই সোনাপুর, রাতাছড়া, কলমখেত ও ব্রজেন্দ্রনগর পাঠশালার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু চাকলা রোশনাবাদের ক্ষেত্রে সরকারি বরাদ্দ বেশি দেখা যায়। সেখানে পাঠশালা স্থাপনের জন্য মোট ৯০ টাকা মঞ্জুরী করা হত। যার মধ্যে ৬০ টাকা শিক্ষকদের বেতন মাসিক ৫ টাকা হিসাবে এবং বাকি ৩০ টাকা "পাঠশালার গৃহ মেরামত ও আবশ্যকীয় আসবাবপত্র ব্যয়িত হইবে।" [২০]

পুরস্কার-ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান ও লেখা পড়াতে আগ্রহ বাড়াতে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য ও

রাজসরকার গ্রহণ করতেন এবং দাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাঁদের নাম গেজেটে প্রকাশ করা হত। বার্ষিক পরীক্ষার ফলানুসারে ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কারস্বরূপ নগদ অর্থ ও পুস্তকাদি প্রদান করা হত। ১৩২৩ ত্রিং সনে সোনামুড়ার উকিল দৌলত আহমেদ, নায়েব সোনাগাজী মজুমদার ও এসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার উক্ত পুরস্কার নগদে দিয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। ২১ এই পুরস্কারের বিজ্ঞপ্তি ১৩২৮ ত্রিং ২৭ শে পুনরায় সোনামুড়াতে,

প্র.লি.বর্ষ	মোটপরীক্ষার্থী M.E.সহ	বৃত্তির শ্রেণি	পাশ করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা		বৃত্তিপ্রাপকের সংখ্যা		বৃত্তির হার	বৃত্তির ব্যাপ্তিকাল
			ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী		
1350TE	1166				10	8	Rs.2-5/-	2 years Per month
		Pathsala	539	115	12	7		
		L.V	193	42				
1351TE	1267	L.V	99	46	10	7	Rs.2-5/-	2 years Per month
		Pathsala	438	103				
1352TE	409	L.V	40	26	7		Rs.2-5/-	2 years Per month
		Pathsala	121	41	10			
1353TE	409	~~L.V~~	~~40~~	~~26~~	10	8	Rs.2-5/-	2-4 years ~~Per month~~
		Pathsala	121	41				
1354TE	401	L.V					Rs.2-5/- Per month	~~2-4 years~~
		Path sala	46	22				
		L.V	~~109~~	~~87~~				
		Pathsala	62	23				

১৩৩৮ ত্রিং ২৭ শে পৌষ কমলপুরে এবং ১৩৩৬ ত্রিং ১৭ই শ্রাবণ তারিখে উদয়পুরেও দেখা যায়। প্রতিক্ষেত্রেই দাতাদের নাম ও অর্থের পরিমাণ বিজ্ঞাপিত হয়েছে।

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা- সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীগণ বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পারে। কবে এই প্রথা রাজ্যে চালু হয়েছিল? বিশেষ সাক্ষ্য প্রাপ্ত না হলেও একটি সম্পর্কিত আদেশে দেখা যায় ১৩২০ ত্রিপুরাব্দের ২৩ শে অগ্রহায়ণ তারিখের ১২ নং মেমো দ্বারা বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি ও মডারেটারদের পারিশ্রমিকের নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল। [২২] পার্বত্য ছাত্রদের পাঠগ্রহণ কালে মাসিক বৃত্তির প্রচলন হয়েছিল১৩০৭ ত্রিং সনের১৬ই বৈশাখের মেমো দ্বারা। ১৩২০ ত্রিং এ ১৩০৭ ত্রি সন হচ্ছে যথাক্রমে ১৯০১ ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। এর পূর্বে বৃত্তি সম্বন্ধীয় কোন দস্তাবেজ পাওয়া যাচ্ছেনা। সেজন্য অনুমান করা যেতে পারেযে ১৮৯৭-১৯০১ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে রাজ্যে বৎসরান্তে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী সময়ে পড়াশোনা চালাবার জন্য ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সে ব্যবস্থা আজও চলে

আসছে। সেকালে উদ্দেশ্য ছিল " ছাত্রছাত্রীদেরশিক্ষার প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ", কিন্তু দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক সাহায্যও প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে। মেধাবী ছাত্রছাত্রী দরিদ্র হলে পড়াশোনায় বাধা আসে। এই সুযোগে বিত্তবানদের মেধাবী পুত্র কন্যরাও সরকারি সাহায্যভোগী হয়ে যায়। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা রাজন্য শাসনের শেষ পাঁচ বৎসরের প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে পর্যালোচনা করে দেখি কি পরিমাণ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হয়েছিল আর্থিক সাহায্য দ্বারা। আমরা ১৩৫০-১৩৫৫ ত্রিং সনের পর্যালোচনা করছি।

সারণী-১

১ বর্ষ ২ মোটপরীক্ষায় বসেছিল ৩ শ্রেণী ৪ পাশ করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫ বৃত্তি প্রাপক সংখ্যা ৬ বৃত্তির হার ৭ বৃত্তির ব্যাপ্তিকাল।

এই সারণীতে দেখা যায় বৃত্তির হার পূর্ব থেকেই লোয়ার ভার্ণাকুলার ও পাঠশালার জন্য ছিল মাসে ২ থেকে ৫ টাকা। ব্যাপ্তিকাল ছিল ২ বৎসর। এই হার কবে চালু হয়েছিল সঠিক সাক্ষ্য নেই তবে আশা করা যেতে পারে যে শুরু থেকেই চালু হয়েছিল। ১৩৫৩ ত্রিং সন থেকে বৃত্তির হার এরকম থাকলেও ব্যপ্তিকাল ২-৪ বৎসর করা হয়েছিল। স্বভাবতই ২ টাকা Pathsala and ৫ টাকা L.V পাশদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের (১৯৩১ ইং) ২৩ শে ভাদ্র তারিখে মহারাজা বীর বিক্রমের এক আদেশে জানা যায় " যেহেতু এ রাজ্যের প্রজাসাধারণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিকশিক্ষা প্রচলন করা এ পক্ষের অভিপ্রেত অতএব কার্যে পরিণথ করা হউক।"[২৪] এই আদেশ মোতাবেক ১৩৪১ ত্রিপুরাব্দের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় ১নং আইন প্রনয়ণ করা হয়। এই আইনের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ হচ্ছে- ৬ বৎসরের অধিক ও বার বৎসরের কমবয়স্ক বালকবালিকাদের পিতা/ অভিভাবক সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে বাধ্য থাকবেন। শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত সময় অর্থাৎ মাসে কতদিন কত ঘন্টা বিদ্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে অনুপস্থিত বলে গণ্য হবে। উক্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে না পাঠালে পিতা/অভিভাবককে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ১০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদায়ে ৭ দিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। একবার দণ্ডিত পিতা/ অভিভাবক পুনরায় অপরাধ করলে জরিমানা হবে দ্বিগুণ এবং অনাদায়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত না করিয়ে অন্য কাজ করতে পাঠালে অনধিক ২৫ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড দিতে হবে এবং অনাদায়ে ১৫ দিন দিন বিনাশ্রমে কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। একবার দণ্ডিত ব্যক্তি পুনরায় ঐ অপরাধ করলে অনধিক ৫০ টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম করাদণ্ড ভোগ করবে। নির্দিষ্ট এলাকায় শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে একবা একাধিক বোর্ড গঠিত হবে। কেউ উপস্থিতির ব্যাপার তত্ত্বাবধান করবে, অনুপস্থিতির সংবাদ পাওয়ার ১ সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠাবার জন্য বা ফর্মে নিযুক্তি বন্ধ রাখার জন্য অভিভাবকের নিকট নিষেধজ্ঞাপক পত্র জারী করবে। অনুপস্থিতির সঙ্গত কারণ, যার জন্য ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে না পাঠালে অপরাধ হবে না, তা হচ্ছে যদি বালক বালিকার বাসস্থানের ১

উপস্থিত ছাত্রছাত্রীর সম্প্রদায়	শিক্ষা বর্ষ				উপস্থিত সংখ্যা									
কুমার	১	১	১	১	-	-	১	৩	-	-	-	-	১	-
ঠাকুর	৫৩	৫২	৫৬	৭২	৫৪	৬৪	৯৭	১২১	১৩৪	১১৯	৯৪	৮৭	১০৬	১০০
মণিপুরী	১	৪	১০	-	৬	২৮	৮	১১	৬	১০	৭	১৩	১৩	১৬
ত্রিপুরা	৩৫	৩২	৩৪	৫৬	২১	১১	৪	১৬	২০	২৬	১	৭	১১	৩৭
লুসাই	-	-	-	-	-	-	-	-		-	১	১		-
খ্রিস্টান/লস্কর	-	-	-	-	-	-	-	-			-			-
বাঙালি হিন্দু	৩১০	৩৯৫	৪৪৯	৪৪০	৪৮৬	৩২৬	৫১৭	৬৪৭	৬৭৪	৭০৪	৬৩৫	৫৩৫	৬০০	৭০৯
মুসলমান	১৮	২৮	২৭	৫৪	৩৮	৪৮	৪১	৫১	৫১	৩৬	৪৪	২৮	২৩	৪১
অন্যান্য	-	-	৮	-	৭	১৭	৪	৭	১৮	১০	৪	১১	৬	৬
রিয়াং	-	-		-	-	-	১	-	-	১	-	-	-	-
ত্রিং শিক্ষা বর্ষ	১৩৪২	১৩৪৩	১৩৪৪	১৩৪৫	১৩৪৬	১৩৪৭	১৩৪৮	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১	১৩৫২	১৩৫৩	১৩৫৪	১৩৫৫
মোট ছাত্রছাত্রী	৪১৮	৫০৮	৫৮৫	৬২৩	৬১২	৪৯৪	৭২৭	৮৫৬	৯০৩	৯০৭	৭৫৬	৬৮২	৭৬১	৯০৯

মাইলের মধ্যে অনুমোদিত বিদ্যালয় না থাকে, ধর্ম সম্বন্ধীয় বা অন্য কোন কারণ যা বোর্ড অনুমোদন করেছে, বয়স্ক বালক বালিকা অন্য কোন উপায়ে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে যদি বোর্ডের এরূপ প্রত্যয় হয়, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে বালক বালিকার সাময়িক বিদায় পাওয়া, অঙ্গহীনতা বা অক্ষমতা হেতু স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে উপস্থিত হবার অযোগ্যতা বোর্ড সমীপে প্রমাণিত হওয়া ইত্যাদি।[২৫] ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় ২নং আইন পাশ হয় এবং শ্রী শ্রীযুতের মঞ্জুরী লাভ করে এবং আগরতলা শহরের ৪টি স্কুলে যথা উমাকান্ত, তুলসীবতী, বিজয়কুমার ও ঠাকুরপল্লী স্কুলে চালু হয়। এই প্রক্রিয়ার একটি ধারাবাহিক চিত্র আমরা পাই ১৩৫৫ ত্রিং সন পর্যন্ত, তা নিম্নে সারণীতে প্রকাশ করা হল। বিভিন্ন সম্প্রদায়েরর কি পরিমাণ ছাত্রছাত্রী আবশ্যিক বাধ্যতামূলক স্কুলে এসেছিল তাও পরিস্কার হবে।

এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হলেও সেকালের বিচারে অতিদূরদর্শিতার পরিচায়ক। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের সীমাবদ্ধ সামান্য আয় থেকে এই প্রচেষ্টা পরবর্তী শাসকদের কাছে উৎসাহমূলক বলে বিবেচিত হতে পারে। এই বিশেষ শিক্ষা কার্যাবলীর জন্য ১৩৪৭-১৩৪৯ পর্যন্ত শিক্ষা বিভাগের খরচ পড়েছিল ৩০২০+ ৩০০০ + ৩২১৪= ৯২৩৪ টাকা অর্থাৎ গড়ে বৎসরে তিন হাজার টাকার কিছু বেশি। ২৭ আগরতলার এই ৪টি স্কুলে ছাত্রসংখ্যার নিরিখে ঠাকুরদের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরীদের কিছু অগ্রগতি হলেও সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছিল বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায় যাদের ছাত্রসংখ্যা উত্তরোত্তর

বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য উপজাতিদের চিত্র বিশেষ কিছু পাই না, সম্ভবত সেকালে আগরতলার পল্লীগুলিতে তারা বেশি বসবাস করত না। কিন্তু রাজ্য সরকার অন্যান্য বলতে কাদের বুঝিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না। সম্ভবত এই প্রচেষ্টায় উৎসাহিত হয়ে মহারাজ বীরবিক্রম ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের ১৬ই আশ্বিণ তারিখে আরও একটি ঘোষণা করেন " যেহেতু এ রাজ্যের প্রজাসাধারণের মধ্যে দ্রুতগতিতে শিক্ষাবিস্তার কল্পে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি প্রবর্তন করা এপক্ষের অভিপ্রেত,অতএব এতদ্বারা ঘোষণা করা যায় যে, আগামী বর্ষ হইতে আপাতত সদর বিভাগান্তগর্ত হাওড়া নদীর উপত্যকা মধ্যে এবং মফঃস্বলস্থ বিভাগীয় নগরসমূহে বিজ্ঞাপিত সীমাবদ্ধ এলাকা মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হউক।" ২৮ কিন্তু তা কার্যকরী হয়েছে বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন,পৃঃ ১০ (১৩০২ ত্রিং এর ১৯নং প্রসিডিং)। পরে 'গেজেট'।

২। তদেব ঃ পৃঃ ১০৪ (সারকুলার নং ৮, ২৩ শে আশ্বিন, ১৩৩০ ত্রিং)।

৩। তদেব ঃ পৃঃ সম্পাদকীয় ১৫-১৬।

৪। Tripura Administration Report 1943-46.Art 256,257, 258, P.69

৫। Tripura gbid : Art 253.

৬। Tripura gbid : Art 25o.P.68.

৭। TTripura gbid : Art 25o.P.68

৮। গেজেট ঃ পৃঃ ২০২।

৯। তদেব ঃ পৃঃ ২০৮।

১০। তদেব ঃ পৃঃ ২১১।

১১। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ (সম্পাদিত) ঃ 'ত্রিপুরা শাসন সংহিতা'।
ঃ অপ্রকাশিত, ১৩০০-১৩০১ ত্রিং; পৃঃ ১০।

১২। গেজেটঃ পৃঃ ১০।

১৩। তদেব ঃ পৃঃ ১১৩

১৪। তদেব ঃ পৃঃ ৩৯৮।

১৫। তদেব ঃ পৃঃ ১৫।

১৬। তদেব ঃ পৃঃ ১১৩।

১৭। তদের ঃ পৃঃ ৩৯৮।

১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ও দত্ত ঃ রাজগী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা-আগরতলা ১৯৭৬ পৃঃ ৩৩১।

১৯। গেজেট ঃ পৃঃ ১৯১।

২০। তদেব ঃ পৃঃ ১৭।

২১। তদেব ঃ পৃঃ ৪০।

২২। তদেব ঃ পৃঃ ২১৫।

২৩। Chakroborty Mahadev (Ed) : The Administration of Tripura, Vol IV , P.P. 2133-2139.
Tripura Administration Report (1353-1355 T.E) Art 258,259.260,261.262.
২৪। রাজগী ঃ পৃঃ ৩৪৩।
২৫। গেজেট ঃ পৃঃ ২০৩,১৪৩।
২৬। Chakroborty Mahadev(Ed): The Administration Report of Tripura Vol IV, P.P. 1607-1612, 1691-97, 1779-84, 1864-1869, 1954-1960, 2060-2066, 2133-2139.
Administration Report of Tripura (1353-1355), Art 267.P.71.
২৭। Chakroborty Mahadev(Ed): The Administration Report of Tripura Vol IV P.P.

সন ত্রিং	স্কুল বালক	স্কুল বালিকা	মোট স্কুল	পড়ুয়া বালক	পড়ুয়া বালিকা	মোট
১৩৫২	১৪	৪	১৮	১৪৫৫	২৮৭	১৭৪২
১৩৫৩	১৪	৫	১৯	১৪৭৪	২২৩	১৬৯৭
১৩৫৪	১৫	৬	২১	১৬৮৭	২৩২	১৯১৯
১৩৫৫	১৬	৬	২২	১৭৭২	৩৫৬	২১২৮

2060-2066.
২৮। রাজগী ঃ পৃঃ ৩৪৭।
মধ্যস্তর (এস.ই.স্কুল)
রাজ্যের মধ্যস্তরের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছিল এম.ই বা মাইনর ইংলিশ স্কুল। এসব স্কুলে প্রাথমিক বিভাগ থেকে শুরু করে ষষ্ঠ শ্রেনি পর্যন্ত পঠন পাঠন হত। ১৩৫৭ ত্রিং সনে রিজেন্ট মাতা মহারাণির এক ঘোষণায় জানা যায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যে ২৫টি মিডল স্কুল ছিল যেখানে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হত। ১ কিন্তু ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং সনের প্রশাসনিক রিপোর্টে বলা হয়েছে ১৯৪৬ সালে রাজ্যে মোট এস.ই স্কুল ছিল ২২টি। ২ তাহলে নিশ্চয়ই এক বছরের মধ্যে আরও তিনটি নতুন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বা ৩টি উচ্চ বাংলা স্কুল মাইনর স্কুল রূপে উন্নীত হয়েছিল। এই স্কুলগুলি কোথায় অবস্থিত ছিল বা এগুলোর নাম কি ছিল তা জানা যাচ্ছে না সাক্ষ্যের অভাবে।
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ঃ ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং সনের উল্লিখিত ২২টি মিডল স্কুলের মধ্যে ৬টি ছিল বালিকা বিদ্যালয়। বাকি ১৬টি বালকদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও বালিকারাও পড়তে পারত। নিম্নলিখিত সারণী থেকে ১৩৫২ থেকে ১৩৫৫ পর্যন্ত ৪ বৎসরের চিত্র পর্যালোচনা করতে পারি।
সারণী -ক °
দেখা যাচ্ছে এই চার বৎসরে ছাত্রছাত্রী বেড়েছে। শেষ বছরে দেখা যায় গড়ে প্রতিস্কুলে বালিকার সংখ্যা ছিল ৫৯ জন এবং ছেলের সংখ্যা ১১০ ।
শিক্ষক ঃ এম.ই. স্কুলে নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু খুঁজে পাওয়া

কঠিন। ১৩১৫ ত্রিপুরাব্দের ১৭ই কার্তিকের কার্যাবলীর বিজ্ঞপ্তিতে ঐ পদের জন্য মাসিক বেতন ২০ টাকা উল্লেখ থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলা হয় নি। ঐ পদ উদয়পুর এম.ই. স্কুলের জন্য বিজ্ঞপিত করা হয়েছিল। ৪ ২০ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দে শ্রীনগর এম.ই.স্কুলের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে মাসিক বেতন ১৫ টাকা এবং কেবল তাদেরই দরখাস্ত করতে বলা হয়েছে যারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশান পাশ। ৫ তাহলে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের এম.ই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বেতনে সমতা ছিল না বা কোন নির্দিষ্ট বেতনহার ছিল না। ১৩১৫ থেকে ১৩৪০ ত্রিং অর্থাৎ প্রায় ১৫ বৎসর পরে বেতন কমে গেছে দেখা যায়। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেতনের হার কি ছিল তা জানা যাচ্ছে না সাক্ষ্যের অভাবে। যদিও ১৩২৫ ত্রিপুরাব্দের একটি নিয়মাবলীতে দেখা যায় মাইনর স্কুলের হেড মাস্টারদের বেতনক্রম ২০-২-৪০ টাকা। [৬] ছাত্র বেতন ঃ ১৩২৫ ত্রিং সনের শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধীয় নূতন নিয়মাবলীতে দেখা যায় যে "নিম্নবাংলা, উচ্চ বাংলা ও মধ্য ইংরেজী স্কুলসমূহে পূর্ব্ববৎ বিনাবেতনে শিক্ষা প্রদান করা হইবে।" ৭ এই ঘোষণায় জানা যাচ্ছে যে ১৩২৫ ত্রিং অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে বিনাবেতনেই ছাত্রছাত্রী এম.ই স্কুলে পড়তে পারত। ১৩৩৯ ত্রিং ১নং সারকুলার

Class	usual Rate		Concession Rate	
	Present rate	Revised rate	Present rate	Revised rate
V and Vi	1/8-	2/2-	1/-	1/10/-
IV	1/4-	1/10-	-/12/-	1/2/-
III	1/4	1/8/-	/-12/-	1/2/-

অনুযায়ী রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের Class III থেকে Class VI পর্যন্ত পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বেতন নেয়ার প্রচলন হয়। অবশ্য রাজকুমার, ঠাকুর, মণিপুরী এবং পার্বত্য প্রজাদের ক্ষেত্রে বেতন ফ্রি করা হয়। নিম্নের সারণীতে বেতনের হার দেওয়া হল।

সারণী খ ৮

শ্রেণি	রাজকর্মচারীদের পুত্রাদি ও স্কুলবিশেষে নির্ভরশীল সহোদর ভ্রাতাদের এবং স্থায়ী এ রাজ্যবাসী প্রজা	অন্যান্য বৃটিশ প্রজা
VI	— ১ টাকা	১।। টাকা
V	— ১। টাকা	১।। টাকা
IV	— দ. আনা	১। আনা
III	— দ. আনা	১। আনা

২০.৩.৪৩ ত্রিং সনের ১লা আষাঢ় থেকে রাজ্যের সমস্ত মধ্য ইংরেজী স্কুলের Class III থেকে Class VI পর্যন্ত বেতনের হার ঘোষণা করা হয়। কিন্তু এই ৫নং সারকুলারে বেতনের হার না পাওয়া গেলেও ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ২নং সারকুলারে বিষয়টি স্পষ্টরূপে জানা যায়। নূতন সারণীটি নিম্নরূপ।

সারণী-গ [৯]

এই সারণী থেকে জানা যায় যে ২০.৩.৪৩ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মানসিক বেতন ছিল যথাক্রমে ১টাকা ৪ আনা, ১টাকা চার আনা, ১ এক টাকা আট আনা এবং ১ টাকা আট আনা।

ভর্তির ফিস ঃ ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের ১নং সারকুলার অনুযায়ী " মাইনর স্কুলে হাইস্কুলে নব প্রবর্তিত নিয়মানুসারে Class III-VI এর প্রত্যেক ছাত্রকে। আনা হিসাবে... ভর্তিফিস দিতে হইবে। একবার রেজিস্ট্রি হইতে কাহারও নাম কর্তন করা হইলে পুনরায় ভর্তি ফিস গ্রহণ ব্যতীত তাহার নাম রেজেস্টরীভুক্ত হইতে পারিবে না।" [১০]

স্কুল ফাণ্ড ঃ ১৩৩৪ ত্রিং সনের ৬নং সারকুলার অনুযায়ী মধ্য ইংরেজীসহ অন্যান্য নিম্নবিদ্যালয়ে ছাত্রগণের অনুপস্থিতি জনিত জরিমানা বাবদ আদায়ী টাকা টেজারীতে দাখিল করার নির্দেশ দেখা যায়। কিন্তু ৯-৩-৪৬ ত্রিপুরাব্দের ৪নং সারকুলারে বলা হয় যে " জরিমানা ভর্তি ফিস ইত্যাদি বাবদ সর্বপ্রকার আদায়ী টাকা দ্বারা একটি 'স্কুল ফাণ্ড' গঠিত হইবে এবং উক্ত টাকা সংশ্লিষ্ট স্কুলের নামে পোস্টেল অথবা অন্য কোনও সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে। উক্ত ফান্ডের টাকা এ বিভাগের মঞ্জুরী মতো স্কুলের উন্নতিজনক ও আবশ্যকীয় কার্যে ব্যয়িত হইবে।" ১১

বিনাবেতনে পাঠ ঃ রাজ্যে বহু পূর্বকাল থেকেই এম.ই স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে বিনাবেতনে পড়তে দেয়া হত কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট ও লিখিত বিধান ছিল না। উপরোক্ত বক্তব্য সমর্থন করে ১৩৫৫ ত্রিং সনের ৪নং সারকুলারে বলা হয় যে সমস্ত সরকারি স্কুল শিক্ষক মাসে ৭৫ টাকার বেশি বেতন পান না তাদের প্রথম সন্তানকে বিনাবেতনে এবং অন্য কোন সন্তানকে অর্ধেক বেতনে পড়তে দেয়া হবে। রাজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের পেনসনারগণ যাদের পেনসন ৩৫ টাকার উর্দ্ধে নয় তারাও উপরে বর্ণিত শিক্ষকদের মত সুযোগ পাবেন। এই সুযোগ ৭৫ টাকা পর্যন্ত বেতন ভোগীর কার্যকালীন মৃত্যুতে তার সন্তানগণ পাবে এবং ৩৫ টাকা পর্যন্ত পেনসানভোগীর মৃত্যুতে তার দুই সন্তানও পাবে। বিনা বেতনে পড়ার ব্যাপারে বয়সের সীমা নির্দিষ্ট করা হয় যেমন III- ৯ বৎসর, IV-১০ বৎসর, V- ১১ বৎসর, VI-১২ বৎসর। কিন্তু যারা পূর্ব থেকেই এ সুযোগ পেত তাদের ক্ষেত্রে বয়ঃবিধি কার্যকরী হয় না। ছাত্রের আচরণ ও লেখাপড়ায় অগ্রগতি অবশ্যই বিচার বিবেচনা করা হত। [১২]

পাঠ্যসূচি ঃ মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়গুলি কি কি বিষয় পড়ান হত সে সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত ধারণা করা

ত্রিং সন	উর্ত্তীণ বালক	উর্ত্তীণ বালিকা	বৃত্তি প্রাপক বালক	বৃত্তিপ্রাপক বালিকা	বৃত্তিহারও ব্যপ্তিকাল
১৩৫২	২২	১২	১০	৭	মাসিক
১৩৫৩	২২	১২	৭	১০	২-৫ টাকা
১৩৫৪	২১	৯	১০	৮	২-৪ টাকা
১৩৫৫	২১	৯	৯	১০	জন্য।

যায় না। ১৭ই ফাল্গুন ১২৯০ বঙ্গাব্দে কুমিল্লা থেকে ' ত্রিপুরা বার্তাবহ' নামক পাক্ষিক পত্রিকায় স্বাধীন

ত্রিপুরার বিদ্যালয়সমূহের ১২৯৪সনের (ত্রিপুরাব্দ) পাঠ্যপুস্তকের তালিকা বিষয়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। তাতে দেখা যায়- ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য সাহিত্য। আর্যকীর্তি তৃতীয়ভাগ (রেজনীকান্ত গুপ্ত কৃত্য)। কুসুম কলিকা, ভাষাবোধ ব্যাকরণ হইতে সন্ধি সমাপ্ত। ভূগোপ। নতুন ভূগোল সাধারণ দুই খণ্ড। গণিত বিজ্ঞান হইতে মিশ্র অমিশ্র চারি নিয়ম। পঞ্চম শ্রেণির জন্য সহিত্য। বোধোদয় হয়, কুসুম কলিকা। 'মিঠকথার পর্যন্ত।" ব্যাকরণ। ভাষাবোধ ব্যাকরণ, স্বরসন্ধি সম্পূর্ণ। গণিত বিজ্ঞান হইতে অমিশ্র চারি নিয়ম। অন্যান্য বিষয় শিক্ষকগণ মৌখিক শিক্ষা দিবেন।"[১৫] এরূপ পাঠ্যতালিকাকে কী বলা যাবে? তারপরে প্রাপ্ত হচ্ছি ১৩২৬ ত্রিপুরাব্দের শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নূতন নিয়মাবলী, যেখানে বলা হয়েছে **" মধ্য ইংরেজী স্কুলের পাঠ্য বিষয় ও বহি** এরূপভাবে নির্বাচন করিতে হইবে যেন এই শ্রেণির বিদ্যালয় **উচ্চ শ্রেণির বিদ্যালয়ের স্বরূপ** হইতে পারে, অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণির বিদ্যালয়ের পাঠের বিষয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পাঠ্য বিষয় ও পুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে। যেন একস্কুল হইতে অপর স্কুলে ছাত্রদের পরিবর্তন সহজ হইতে পারে।" [১৪] কিন্তু কি কি বিষয়ে কি কি পাঠ্যবই নির্বাচিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই।

ছাত্র বৃত্তি ঃ ষষ্ঠ শ্রেণিতে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা পাশের পরে নির্বাচিত ছাত্রছাত্রী গণ সেই বৎসরের বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পেত। ১৩৫২-১৩৫৫ ত্রিং সনের মধ্য ইংরেজি স্তরের বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বালকবালিকাও বৃত্তি প্রাপকদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সারণী-গ[১৭]

কৃষিকাজ ঃ ২২.১.১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ৩নং সারকুলারে কৃষিকাজ করার জন্য ছাত্রদের উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রেরই কৃষি বিষয়ে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন একান্ত আবশ্যক। এমতাবস্থায় ছাত্রগণের কৃষি বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থোন্নতির জন্য প্রত্যেক ... মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের চতুপার্শে সংরক্ষিত ভূমি শাকসব্জির চাষ করা সঙ্গত। প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহে অন্যূন তিন ঘন্টাকাল এই শাক সব্জির কার্য দ্বারা শিক্ষালাভ করিলে তাহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পাইবে। " ১৬ বলা বাহুল, এই কৃষিকাজ পরীক্ষা বিষয়বস্তু ছিল না। কিন্তু ছাত্ররা শিক্ষকদের নির্দেশে উৎসাহ সহকারে করত।

আন্যান্য ঃ ১৩৫৬ ত্রিং সনের ৯ই কার্তিক তারিখের ৯নং সারকুলার থেকে জানা যায় যে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের ভারতবর্ষের ভূগোল, ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে খুব দুর্বল ধারণা রয়েছে সেজন্য Minoo Massani লিখিত Our India and Pictue of a Plan রাজ্যের সকল শিক্ষক ও ছাত্রদের অধ্যয়ন করতে হবে। মধ্য ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকদের বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে তারা তথ্যগুলি সেভাবেই শ্রেণিতে বিশ্লেষণ করবেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা সুনিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে। তারপরেই কিছু বাছাই করা বিষয় থেকে ৩০ শে মাঘ ১২ টার সময়ে তিনঘন্টার ব্যাপ্তিকালের একটি রচনা প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীদের যোগ দিতে বলা হয়েছে। শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে রচনা প্রতিযোগিতা করিয়ে নিজে মূল্যায়ন করে শ্রেণির দুইটি শ্রেণি রচনা ইনসপেকটার অব স্কুলের নিকট পাঠাবেন। সমস্ত স্কুল থেকে জমা হওয়া এসব রচনা ইনসপেক্টার মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়ন শেষে

সর্বশ্রেষ্ঠ দুখানা রচনার জন্য ৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণির দুই প্রার্থীদের ২০ টাকা ও ৫ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করবেন।[১৭]

পাদটীকা ঃ

১। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন (পরে গেজেট)ঃ পৃঃ সম্পাদকীয় ১৫। এম.ই.৫

২। Administration Report of Tripura 1353-55 TE. (1943-1946),Art 256.

৩। তদেব ঃ পৃঃ ৬৯।

৪। গেজেট ঃ পৃঃ ৩১।

৫। তদেব ঃ পৃঃ ৫২।

৬। তদেব ঃ পৃঃ ৬৯।

৭। তদেব ঃ পৃঃ ৬৭।

৮। তদেব ঃ পৃঃ ২১০।

৯। তদেব ঃ পৃঃ ২২৬-২৭।

১০। তদেব ঃ পৃঃ ২০৭-২০৮।

১১। তদেব ঃ পৃঃ ২১৭।

১২। তদেব ঃ পৃঃ ২২৪-২৫।

১৩। দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রাজনি ত্রিপুরার সরকারি বাংলা , ১৯৭৬, পৃঃ ৩৩০-৩১।

১৪। গেজেট ঃ পৃঃ ৬৭।

১৫। Administration Report of Tripura 1353-55 TE, Art 259-262. Chakraborty Mohadev (ED)Administration Report of Tripura. Vol IV.

১৬। গেজেট ঃ পৃঃ ২২৭।

১৭। তদেব ঃ পৃঃ ২৩১-৩২।

মধ্যস্তরের শিক্ষা (হাইস্কুল)

রিজেন্ট মাতা মহারাণির ঘোষণায় জানা যায় যে ১৯৪৯ সালে ভারত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের প্রাককালে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৯টি হাইস্কুল ছিল। ১ স্কুলগুলি হচ্ছে উমাকান্ত একাডেমী, বোধজঙ্গ হাইস্কুল, নবদ্বীপ চন্দ্র ইনস্টিটিউশান, কিরীট বিক্রম ইনস্টিটিউশন,ব্রজেন্দ্র কিশোর ইনস্টিটিউশান, রাধাকিশোর ইনস্টিটিউশান, বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশান, মহারানি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় এবং খোয়াই হাইস্কুল। স্কুলগুলির মধ্যে উমাকান্ত, বোধজঙ্গ ও তুলসীবতী রাজধানী আগরতলাতে অবস্থিত। নবদ্বীপচন্দ্র সোনামুড়া সদরে , কিরীট বিক্রম উদয়পুর সদরে, ব্রজেন্দ্র কিশোর বিলোনিয়া সদরে, বীরবিক্রম ধর্মনগর সদরে, রাধাকিশোর কৈলাসহর সদরে এবং খোয়াই হাইস্কুল খোয়াই সদরে অবস্থিত। এসব স্কুল প্রাথমিক স্কুল হিসাবে স্থাপিত হবার পরে ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে হাইস্কুল পর্যায়ে পৌঁছে এবং

স্কুলগুলি তখন স্থানের নামে পরিচিত ছিল যেমন আগরতলা হাইস্কুল, উদয়পুর হাইস্কুল ইত্যাদি। পরে যথারীতি গেজেট ঘোষণা দ্বারা বিভিন্ন স্কুলের নামাকরণ রাজা বা বিশেষ প্রভাবশালী রাজপুরুষের নামে করা হয়। একমাত্র ব্যতিক্রম খোয়াই হাইস্কুল কেন এরূপ সম্মান থেকে বঞ্চিত হল তা জানা যায় না। একমাত্র বালিকা বিদ্যালয়ও মহারানি তুলসীবতীর নামে নামাকরণ করা হয়েছিল।

ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ঃ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে রাজ্যে সরকারি স্কুল স্থাপন করে জনসাধারণের শিক্ষাকর্মের সূচনা করা হয়। সেক্ষেত্রে ১৯৪৬ সালে ৯টি স্কুলে, যার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে মধ্যস্তর অর্থাৎ ৫ম থেকে অষ্টম শ্রেণিও অর্ন্তভুক্ত ছিল, মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখা যায় ২৯৩৭ জন। ২ তাহলে দেখা যায় প্রতিটি হাইস্কুলে গড়ে প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করত। অবশ্যই নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রম ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত। এই অগ্রগতি ৮৫ বছরের প্রচেষ্টার ফল কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় নিতান্ত কম বলেই বিবেচনা করতে হবে কারণ ১৯৪৬ সালে রাজ্যে জনসংখ্যা ছিল ৫,১৩,০১০ জন ও অথচ বিদ্যালয়ে আনার জন্য রাজসরকার সুযোগসুবিধা কম দিয়েছেন অন্তত সেকালের বিচারে তা বলা যাবে না। ১৯৪৬ সালে রাজ্যের মোট ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় বসেছিল যার মধ্যে ৮১ জন ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়েছিল। ৪ হিসাবে ৮টি স্কুলের ফল দেখান হয়েছে, এরমধ্যে বোধজঙ্গ স্কুলের নাম এই তালিকায় নেই। খুব সম্ভবত ঐ স্কুল থেকে সে বৎসরে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে কোন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বসেনি।

শিক্ষক ঃ এইসব হাইস্কুলের জন্য নিয়োজিত শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনক্রমের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৩২৫ ত্রিং সনের গেজেটে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষকদের বেতনক্রম ছিল — সাধারণ গ্র্যাজুয়েট ৫০-৫-১০০ টাকা, আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট ৪০-২-৬০ টাকা, অন্যান্য বিশেষ শিক্ষক ৩০-২-৫০ টাকা, অন্যান্য শিক্ষক ২০-২-৪০ টাকা। ৫ ১৩২৮ ত্রিং সনের গেজেটে দেখা যায় সে সময়ে উমাকান্ত হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন ১০০-৫-২০০ টাকা কিন্তু অন্যান্য হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতনের হার ছিল ৫০-৫-৭৫ টাকা এবং উমাকান্তের সাধারণ শিক্ষক ৫০-৫-১০০ টাকা ও অন্যান্য স্কুলের সাধারণ শিক্ষক ৪০-২-৬০ হারে বেতন পেতেন। ৬ ১৩৩০ ত্রিং সনে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষকের বেতনের হার ছিল বি.এ/ বি.এস.সি ৫০-৫-৭৫ টাকা, নর্মাল পাশ সহকারী শিক্ষক ২০ ও পার্শী শিক্ষক ৩০-৪০ টাকা, ভূগোলসহ বিটি শিক্ষক ৭০ টাকা, আই.এ পাশ ইঙ্গ-সংস্কৃত শিক্ষক ৩০-২-৫০ টাকা, সহকারী উর্দু শিক্ষক ৩০-২-৫০ টাকা। ৭ হাইস্কুলের কোন কোন বি এ পাশ শিক্ষকদের বেতনের হার ছিল ৩০-২-৫০ টাকা। উমাকান্ত একাডেমীর সহকারী শিক্ষকদের বেতনের হার ও বৈষম্য দেখা যায়। ১৩৩৮ ত্রিং সনের গেজেটে দেখা যায় উমাকান্ত একাডেমীর জন্য সহকারী শিক্ষকদের জন্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে বেতন হার রয়েছে ৪০-২-৬০ টাকা। ৮ এসব বিজ্ঞাপন ও বিবরণী সাক্ষ্য দেয় যে হাইস্কুলের শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষকদের বেতনের কোন সার্বজনীন স্কেল বা গ্রেড ছিল না। ফলে একই কাজ করে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম বেতন পেতেন যা সমকাজে সমবেতন রীতির পরিপন্থী। এজন্য শিক্ষকদের মানসিক যন্ত্রণা অবশ্যই ছিল কিন্তু সেকালে তার বর্হিপ্রকাশ আদৌ সম্ভব ছিল না। প্রতিটি হাইস্কুলে একজন করে ড্রয়িং শিক্ষক ছিলেন, কেননা লেখক নিজে ঐ সব শিক্ষকদের নিকট

পাঠ নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বেতনকম কি ছিল তার কোন সাক্ষ্য আপাতত পাচ্ছি না।
শিক্ষকদের বেতন দেয়া হত ঠিকই, কিন্তু তা নিয়মিত ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। মাসের ঠিক কোন তারিখে তাঁরা বেতন পেতেন আমরা জানি না, কোন সাক্ষ্য আমাদের হাতে নেই তবে বেতন প্রদান যে অনিয়মিত ছিল তা তদানীন্তন Bengal Administration Report এ উল্লেখ রয়েছে। অর্থনৈতিক এই প্রতিবন্ধকতাও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিন্তু রাজকীয় সরকার কিছুসংখ্যক উৎসাহ প্রদানমূলক করেছিলেন। "হিন্দু রাজা বিদ্যাদান করে, বিক্রি করে না" - রাধাকিশোরা মাণিক্যের এই নীতি অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন ছাত্রছাত্রীকে বেতন দিয়ে স্কুলে পড়তে হত না। উনিশ শতকের শেষভাগে নিতান্ত অনগ্রসর অতি দরিদ্র একটি রাজ্যের পক্ষে এই নীতি নিশ্চয়ই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজ্যের আর্থিক দুর্বলতা, পারিপার্শ্বিক চাপ প্রভৃতির ফলে রাজসরকার ঐ নীতিতে স্থির থাকতে পারেনি। হাইস্কুলের ছাত্রদের নিকট থেকে প্রথম বেতন নেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯১৬-

শ্রেণি	সাধারণ হার	বর্দ্ধিত হার	বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হার	
	বর্তমান		বর্তমান	বর্দ্ধিত হার
ix-x	২।	৩	১।।	২।
vii-viii	১৪	২।।	১।	২
V-Vi	১	২	১	১।।

১৭ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেও সম্ভবত ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা হয়নি। কারণ ১৩৩৯ ত্রিং সনে (১৯২৯ খ্রিঃ) আবার বেতন চালু করার নির্দেশ থেকে এই ধারণা করা যায়। ৯ বা ১৯১৬-১৭ খ্রিস্টাব্দে বেতন নেয়া শুরু হয়। এসব টানাপোড়েন থেকে রাজসরকারের প্রকৃত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছাত্রবেতন ঃ রাজ্যে অবস্থিত হাইস্কুলে পাঠরত ছাত্রদের বেতনের হার বরাবরই বৃটিশ রাজ্যে অবস্থিত স্কুলের বেতনের হার থেকে কম ছিল। সাধারণত বৃটিশ এলাকার তুলনায় অর্ধেক বেতন নেয়া হত। ১৩২৫ ত্রিং সনে (১৯১৫ খ্রিঃ) উমাকান্ত একাডেমী, বিলোনিয়া ও কৈলাসহর হাইস্কুলের সাধারণত ছাত্রদের বেতন কুমিল্লা জেলা স্কুলের অর্ধহারে ধার্য করা হয়। হাইস্কুলে পাঠরত রাজকুমার, ঠাকুর, মণিপুরী ও পার্বত্য প্রজাদের থেকে কোন বেতন নেয়া হত না। রাজকর্মচারীদের পুত্রাদি, সহোদর ভ্রাতাদের অর্ধেক বেতনে পড়তে দেয়া হত। ১৩৩৯ ত্রিং সনের ১নং সারকুলার অনুযায়ী রাজকর্মচারীদের পুত্রাদি, সহোদর ভ্রাতা ও রাজ্যের স্থায়ী প্রজাদের ক্ষেত্রে বেতনের হার ও বৃটিশ প্রজাদের যারা এ রাজ্যের স্কুলে পড়ত, তাদের ক্ষেত্রে মাসিক বেতনের হার ছিল নিম্নরূপ ঃ

শ্রেণি	রাজকর্মচারীদের পুত্র ইত্যাদি	বৃটিশ প্রজা
X	১।।	২।
IX	১।।	২।
VIII	১।	১½

VII	১।	১½
VI	১।	১।।
V	১।	১।।

সর্বশেষ বেতন কাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায় ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৬ সালের ঘোষণায় যা ১.১.৫৬ ত্রিং থেকে কার্যকরী হয়।[১০]

এই হার দেখে মনে হচ্ছে ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের পরে অন্তত আর একবার বেতন হার পরিবর্তন করা হয়েছিল। ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ঘোষিত হার চাকলা রোশনাবাদের জমিদারীতে কর্মরত কর্মচারীদের পুত্রকন্যাদের, যদি তারা এই রাজ্যের স্কুলে পড়াশোনা করত, সে ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল।[১১]

বিনাবেতনে পাঠদান ঃ বিনাবেতনে অধ্যয়ন বা ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রথা রাজ্যে চালু ছিল। ১৩৫৫ ত্রিং সনের ৪নং সারকুলার এ বলা হয় রাজ্যের যে সমস্ত স্কুল শিক্ষক মাসে ৭৫ টাকা পর্যন্ত বেতন পান তাদের প্রথম সন্তান ছেলে পূর্ণবিনাবেতনে এবং অন্য একসন্তান অর্ধেক বেতনে পড়তে পারবে।শিক্ষা বিভাগের পেশননারগণ যাদের পেনশন ৩৫ টাকার উর্দ্ধে নয় তাদের সন্তানরাও উপরোক্ত সুযোগ পাবে।৭৫ টাকা বেতনভোগীর কর্মকালে মৃত্যুতে এবং পেনশনভোগীর (৩৫ টাকার বেশি নয়) মৃত্যুতে তাদের সন্তানগণও বিনাবেতনে পড়বার উপরোক্ত সুযোগ পাবে। অবশ্যই মহারাজকুমার, কুমার ,ঠাকুরলোক, মণিপুরী, ত্রিপুরী, লস্কর ও অন্যান্য পার্বত্য প্রজাদের পুত্রগণ বিনাবেতনে পড়তে পারবে। কিন্তু শ্রেণিভিত্তিক বয়সসীমার মধ্যেই তারা ঐ বিনাবেতনের সুযোগ পাবে। যেমন x-১৬ বৎসর, ix-১৫ বৎসর, viii- ১৪ বৎসর, VI- ১২ বৎসর, V-১১ বৎসর ইত্যাদি। কিন্তু এই বয়ঃসীমা মহারাজ কুমার, কুমার, ঠাকুরলোক মণিপুরী, ত্রিপুরী, লস্কর ও অন্যান্য পার্বত্য প্রজাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। এই ঘোষণার পূর্বে যদি কেউ এই সুযোগ পেয়ে থাকে তাহলে বয়স বেশি হলেও ছাত্রের যোগ্যতা, ব্যবহার বিবেচনা করে তাকে সুযোগ দিতে হবে।[১২]

বৃত্তি ঃ ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করেছিল রাজসরকার। উদ্দেশ্য, অধিক সংখ্যক ছাত্রদের শিক্ষার দিকে টেনে আনা এবং মেধাবী ছাত্রদের উচ্চতর স্তরে পড়াশোনার পথ সুগম করা। ১৩১২ ত্রিং সনের (১৯০২ খ্রিস্টাব্দের) ৩০ শে আষাঢ় তারিখের ৩নং সার্কুলারে বীরচন্দ্র বৃত্তি ও জুনিয়ার বৃত্তি কেবলমাত্র উমাকান্ত একাডেমীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করা ছিল কারণ রাজ্যে তখন আর কোন হাইস্কুল ছিল না। কিন্তু ১৪-৪-৪১ ত্রিং সনের (১৯৩১ খ্রিঃ) একটি ঘোষণায় দেখা যায় যে রাজ্যের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে ১২ টাকার একটি বৃত্তি এবং মফঃস্বলের ৪টি হাইস্কুলের প্রত্যেকটির জন্য ৮ টাকার একটি বৃত্তি এবং স্থানীয় উমাকান্ত একাডেমীর জন্য ১০ টাকার একটি বীরচন্দ্র বৃত্তি ও ৮ টাকার একটি জুনিয়ার বৃত্তি প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। এই আদেশে আরও দেখা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত সমগ্র হাইস্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এই রাজ্যের কোন ছাত্র প্রথম থেকে দশম স্থানের অধিকারী হলে তাকে মাসিক ২০ টাকা হিসবে একটি বৃত্তি ,এই রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হাইস্কুলের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীকে ১৫ টাকার একটি বৃত্তি , দ্বিতীয় স্থানাধিকারীকে ১০ টাকার একটি বৃত্তি এবং ৩য়

স্থানাধিকারীকে ৮ টাকার একটি বৃত্তি প্রদান করার কথা উল্লেখ রয়েছে। ১৩
১৯৩৪ ত্রিং সনের একটি মেমোতে দেখা যায় রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত হাইস্কুলগুলির মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীগণকে ১লা বৈশাখ ১৩৩৪ ত্রিং সন থেকে দুই বৎসর কালের জন্য বৃত্তিপ্রদান করা হয় এবং কলেজে ভর্তিহয়ে প্রিন্সিপালের যোগে আবেদন করলে মঞ্জুরী প্রদান করার আদেশ করা হয়। ১৩৩৬ ত্রিং সনের বৃত্তি প্রাপকদের (৩১ শে শ্রাবণ ৩নং মেমো) তালিকায় দেখা যায় যে প্রথম স্থানাধিকারীর বৃত্তি মাসিক ১২ টাকা এবং অন্যান্যদের জন্য স্থানীয় বৃত্তি ও বীরচন্দ্র বৃত্তির হার অপরিবর্তিত রয়েছে। ১২ টাকার বৃত্তির ক্ষেত্রে বৃত্তি প্রকারে কলামে প্রতিযোগিতা বৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। সকল বৃত্তিরই ভোগকাল ২ বৎসর অর্থাৎ কলেজে ২ বৎসর এফ.এ বা ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্যই বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ১৪

শারীর শিক্ষা ঃ হাইস্কুলে খেলাধূলা, ড্রিল ইত্যাদি শারীরিক শিক্ষা ও ড্রয়িং শেখাবার ব্যবস্থার বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব বিষয় অবশ্যই ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষার বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত ছিল না কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে যোগদান আবশ্যিক ছিল। অপরদিকে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে রীতিমত ধরে রাখার জন্য অনুপস্থিতির জরিমানা ধার্য করা ছিল। ২১.৮.৩৪ ত্রিং সনের আদেশ বলে ঐসব জরিমানাবাবদ সংগৃহীত অর্থ ট্রেজারীতে দাখিল করার নির্দেশ দেয়া যায়। কিন্তু পরে ১২.৩.৪৬ ত্রিং সনের নির্দেশ অনুযায়ী জরিমানা ও ভর্তি ফিস বাবদ লব্ধ অর্থ ট্রেজারীতে জমা না দিয়ে 'স্কুল ফাণ্ড গঠন করে, সংশ্লিষ্ট স্কুলের নামে পোষ্টাপিসে বা ব্যাঙ্কে রাখার কথা বলা হয়েছে যাতে জরুরী প্রয়োজনে মঞ্জুরী নিয়ে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ব্যয় নির্বাহ করা যায়। ১৫

কৃষিকাজ ঃ ২২.১.১৩৫৬ ত্রিং সনের সার্কুলার অনুসারে হাইস্কুলের ছাত্রদের কৃষিকাজে অভিজ্ঞতা ও স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের চতুঃপার্শ্বস্থ জমিতে সপ্তাহে অন্তত তিনঘন্টা বাগানের কাজ করার নির্দেশ দেখা যায়। শাকসবজি কাজে শিক্ষালাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে খাদ্যসমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার ইঙ্গিত ও আদেশে দেখা যায়। ১৬ যদিও সেকালীন ছাত্ররূপে বিদ্যালয়ের সমস্থ ফুলের বাগানে কাজ করেছি কিন্তু শাকসবজির বাগান ছাত্রদের দ্বারা হত বলে স্মরণ করতে পারছি না।

অন্যান্য ঃ এখানে উল্লেখ্য বিষয় এই যে সেকালের শিক্ষা বিজ্ঞানের কর্মকর্তাদের ও পঠনীয় বিষয় ছাড়াও সহপাঠমিক কার্যাবলীর ধারণা ছিল এবং পরীক্ষার বিষয়বস্তু না করেও বিদ্যালয়গুলিতে তা প্রচলিত করতে পেরেছিলেন। এছাড়াও মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতামূলক রচনা লেখান হত। ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ৯ই কার্তিক তারিখের ৯নং সারকুলারে জানা যায় যে যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের ভারতের ইতিহাস, ভূগোল ও অর্থনীতি সম্বন্ধে খুবই দুর্বল ধারণা রয়েছে সেজন্য Minoo Massani লিখিত Our India and Picture of a plan খুবই ভালভাবে রাজ্যের প্রত্যেক শিক্ষক ও ছাত্রদের অধ্যয়ন করতে হবে। এই পুস্তক পাঠে উৎসাহ দেবার জন্য ২৩ শে মাঘ ১৩৫৬ ত্রিং প্রত্যেক হাইস্কুলের শিক্ষার্থীদের ৩ ঘন্টা ব্যপ্তিকালের একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রবন্ধ লেখাবার ব্যবস্থা করা হয়। Our India র নিম্নলিখিত topic থেকে রচনা নির্বাচন করতে বলা হয়। i) Sometimes but sometimes- 4x5=20, ii) wool as a tree, iii) What funny term that is

what on earth does horse power mean? iv) Sare jahase Achea Hindustan Hamaa. High School এ শ্রেণিগুলি Group A-IX and X, Group B VIII and VII এ ভাগ করে Group A র জন্য ৩০্ ও ১০্ টাকা এবং Group B র জন্য ২৫্ ও ১০্টাকা নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে রচনা প্রতিযোগিতা করিয়ে মূল্যায়ন কবে শীর্ষবাছাই দুইটি রচনা Inspector of School এর নিকট শেষ মূল্যায়নের জন্য পাঠাবেন বলে নির্দেশ দেয়া হয়। ১৭

পাদটীকা

১। বন্দোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন (সম্পাদিত) ঃ ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, আগরতলা ১৯৭১ খ্রিঃ ভূমিকা ১৫ পরে (গেজেট সংকলন)।

২। Tripura Administration Report (1943.46)Art. 251.

৩। M.Chakroborty Vol IV (1943-46)P.2077.as per census of 1941.

৪। Tripura Administration Report (1943-46) Art 253.

৫। গেজেট সংকলন পৃঃ ৩৯।

৬। তদেব পৃঃ ১২।

৭। তদেব পৃঃ ১১।

দত্ত ও বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রজনী ত্রিপুরার সরকারি বাংলা, আগরতলা, ১৯৭৬, পৃঃ ১২২।(পরে রাজগী)

৮। গেজেট সংকলন ঃ পৃঃ ১২২।

৯। তদেব ঃ পৃঃ ২১০।

১০। তদেব ঃ পৃঃ ২২৬।

১১। তদেব ঃ পৃঃ ২২৩।

১২। তদেব ঃ পৃঃ ২২৪,২২৫।

১৩। তদেব ঃ পৃঃ ২০৫।

১৪। তদেব ঃ পৃঃ ২১৩।

১৫। তদেব ঃ পৃঃ ২১৭।

১৬। তদেব ঃ পৃঃ ২২৭।

১৭। তদেব ঃ পৃঃ ২৩১-২৩২।

উচ্চ শিক্ষা

রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরা রাজ্যে কলেজ স্থাপন করে উচ্চ শিক্ষার সূচনা করেন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে রাজধানীস্থ উমাকান্ত একাডেমীতে কলা বিভাগ সমন্বিত একটি দ্বিতীয় শ্রেণির মহাবিদ্যালয় চালু করেন। [১] উপযুক্ত অধ্যাপকবৃন্দ নিযুক্ত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের অনুমোদন ক্রমে ঐ মহাবিদ্যালয় চলতে থাকে। কলেজ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে প্রশাসনিক বিবরণীতে বলা

হয়েছে— " The Chief object of the state in having a college of its own, is to give higher education to the Thakur boys who are the sons of the local nobles". [2]

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে ১ম বর্ষে ৯ জন এবং ২য় বর্ষে ৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। সেজন্য ধারণা করা যেতে পারে যে কলেজের কাজ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দেই শুরু হয়েছিল তা না হলে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র এল কি করে? সম্ভবত কলেজের কাজ শুরু করে অনুমোদনের জন্য লেখালেখি করতে করতে ১৯০১খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। রাধাকিশোরের নীতি অনুযায়ী 'হিন্দু রাজা বিদ্যাদান করে, বিক্রি করেনা' কলেজ ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তবর্তী বৃটিশ শাসিত বঙ্গদেশের জেলাগুলি থেকে ছাত্র এসে আগরতলা কলেজে ভর্তি হতে লাগল যা কিছুদিন পরেই নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। ছাত্রদের মেধা অনুসারে পরবর্তী শ্রেণিতে অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হত। ঠাকুর লোকদের জন্য কলেজ খোলা হলেও অন্যান্য সবাই সমভাবেই কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পেত। যদিও কলেজের হাজিরা খাতা বা অন্যান্য দলিল পত্রাদির সন্ধান আমার বর্তমানে পাচ্ছি না তবু - " শ্রী উমেশ চন্দ্র দে ও শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র সেন আগরতলা কলেজ হইতে এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহাদের প্রত্যেককে মাসিক ১৫্ পনের টাকা হিসাবে দুই বৎসরের তরে সিনিয়ার বৃত্তি নির্ধারিত হইল।" [৩] এই বৃত্তি ঘোষণা প্রমাণ করে যে কলেজে ঠাকুরলোক ছাড়াও অন্যান্য সকলে অধ্যয়নের সুযোগ পেত।

১৯০২ খ্রিস্টাব্দের এফ.এ.পরীক্ষায় ২ জন উত্তীর্ণ হয়, একজন দ্বিতীয় বিভাগে অপরজন তৃতীয় বিভাগে। উভয়কেই দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১৫্ টাকা হারে বৃত্তি দেয়া হয়েছিল। [৪] বৎসরের শেষে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৫ জন। ১৯০২-১৯০৩ সালে কলেজের ছাত্র সংখ্যাছিল ৫২ জন। এফ.এ. পরীক্ষায় বসে ২৫ জন, পাশ করে দ্বিতীয় বিভাগে ১জন, তৃতীয় বিভাগে ৪জন অর্থাৎ মোট ৫জন। মেধা অনুসারে প্রথম দুইজনকে সিনিয়ার বৃত্তি প্রদানকরা হয়েছিল। ৫ ১৯০৩-১৯০৪ সালে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮ জন, ২৫ জন এফ.এ. পরীক্ষায় বসে, পাশ করে ১৫ জন যার মধ্যে ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২ জন তৃতীয় বিভাগে। দেখা যাচ্ছে ক্রমে এফ.এ পরীক্ষায় পাশের সংখ্যা বেড়েছিল এবং মেধা অনুসারে প্রথম দুইজন সিনিয়র বৃত্তি পেয়েছিল। ১৯০৪-১৯০৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম ছয়মাস কলেজ চলার পর কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কলেজ বন্ধ করার কারণ সম্বন্ধে অনেকে রাজা রাধাকিশোরের হিন্দু রাজার বিদ্যাদান নীতি দায়ি বলে মনে করেন। কারণ সে সময়ে আগরতলা কলেজের সাফল্যে পার্শ্ববর্তী বঙ্গদেশের বৃটিশ এলাকায় অবস্থিত কলেজগুলিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সেখানে ছাত্রদের বেতন দিয়ে পড়তে হত। ফলে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী সেখানে বাস করলেও ঐ সব কলেজে ভর্তিনা হয়ে আগরতলা কলেজে বিনাবেতনে পড়ার জন্য এখানে চলে আসত। কুমিল্লাতে অবস্থিত ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রতিবছর ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে। ঐ কমার কারণ হিসাবে আগরতলা কলেজে বিনাবেতনে পাঠদান নীতিই দায়ি বলে অনেকে মনে করেন। ফলে আগরতলা কলেজ বন্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার চাপ সৃষ্টি করে এবং এই চাপের ফলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন

বাড়াতে অস্বীকার করে। এভাবে ক্রমাগত বৃটিশ রাজশক্তির চাপে বাধ্য হয়ে ব্যথিত হৃদয়ে রাধাকিশোর শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি সময়ে কলেজ বন্ধ করে দেন। বৃটিশ রাজশক্তির এই অন্যায় চাপ ও কলেজ বন্ধ করার প্রতিক্রিয়া বঙ্গদেশেও পড়ে। অমৃত বাজার পত্রিকা জানাচ্ছেন The Maharaja of Tpperah is compelled by the Bengal Governments wishes to abolish in july, the students are thrown overboard ." [৬] অথচ ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দেই " শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ, এম.এ আগরতলা কলেজের প্রিন্সিপাল পদে নিযুক্ত হইলেন। দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কার্য্যে উপস্থিত হইবার তারিখ হইতে মাসিক মং ৩৫০্ তিন শত পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইবেন।" [৭] এই নিযুক্তিপত্রের ঘোষণা ১৩১৪ ত্রিং সনের ১৪ই শ্রাবণ তারিখের ৪নং মেমো দ্বারা হয়েছিল। শ্রাবণের মাঝামাঝি সময় হচ্ছে আগস্টের একেবারে প্রথম দিকে। অর্থাৎ আগস্টের প্রথমদিকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেও আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে কলেজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন রাজা। এতে পরিস্কার বুঝা যায় যে বৃটিশ চাপ উপেক্ষা করেও রাজা কাজ করে চলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

এই ঘটনার ৩৪ বৎসর পরে ১৯৩৭ খ্রিঃ ৭ই মে (২৪ শে বৈশাখ, ১৩৪৭ ত্রিং) রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন রাধাকিশোর মাণিক্যের পৌত্র বীরবিক্রম কিশোর। উল্লিখিত তারিখে রসমনটিলাতে তিনি কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। [৮] এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাপত্তন নির্মাণ সম্বন্ধীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির হস্তে প্রকল্প বাস্তবায়িত করার ভার দেওয়া হয়। [৯] রসমনটিলা বর্তমানে কলেজটিলা নামে পরিচিত। সেখানে অট্টালিকা নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ধীরে ধীরে অট্টালিকা তৈরি হতে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সামরিক তৎপরতা ও অর্থাভাবের জন্য কাজ অতি শ্লথ গতিতে চলতে থাকে। সে সময়ে সামরিক প্রয়োজনে কলেজগৃহ নিগ্রো বাহিনীর দখলে চলে গিয়েছিল। যুদ্ধশেষে পুনরায় কাজ শুরু হলেও অর্থাভাবই প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায় কাজ শেষ হবার পথে। ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ২রা জৈষ্ঠ বীর বিক্রম কিশোর দেহত্যাগ করেন। রাজমাতা কাঞ্চনপ্রভাদেবী চাকলা রোশনাবাদ থেকে ১ লক্ষ টাকা এনে কলেজের কাজ শেষ করবেন বলে ঘোষণা করেন। ৯ অবশেষে অসমাপ্ত নির্মাণকার্য সমাপ্ত করে, ১৩৫৭ ত্রিং সনেই কলেজে অধ্যাপনার কাজ শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের নামানুসারে কলেজের নামাকরণ করা হয় ' মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ'। কলেজে লেখাপড়ার কাজ শুরু হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে। ১০ সে সময়ে আই. এ ও আই.এস.সি.ক্লাস শুরু করা হয়।

পাদটীকা

১। Tripura Administration Report 1900-1901.P.14.
২। Tripura Administration Report 1901-1902.P.19.
৩। Memo No370 dt17th Srabana .(1903-04).
৪। Tripura Administration Report 1901-1902.P.19.
৫। -do- 1902-1903.P.18.

৬। Amrit Bazar Patrika, dated 20th August 1904.
৭। Dutta and Banerjee : Rajgi Tripura Sarkari Bangla, Agartala. P.342.
৮। Gan Choudhury Jagadish : Tripura It has,Agartala 2000AD,P.185.
৯। -do- P.202.
১০। Menon K.D.(Ed) : Tripura District Gazetteer,Agartala 1975, P. 316-17.

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষাদান একটি জটিল ব্যবহারিক প্রক্রিয়া। ব্যক্তি নিজে যথেষ্ট জ্ঞানী হলেও উত্তম শিক্ষক নাও হতে পারেন। এই কাজের জন্য ব্যক্তিকে বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে সমাজ কর্তাদের অজ্ঞতা এবং অনভিজ্ঞতা বিশেষ অন্তরায় সৃষ্টি করে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। শিক্ষা প্রশাসকনণ যে এ ব্যাপারটি জানতেন না বা বুঝতেন না তা ঠিক নয়, তার সাক্ষ্য পাওয়া যায় গেজেট বিবরণীতে। কি ক্তু তারা ঠিকভাবে সমাজকর্তাদের রাজি করাতে পারতেন না, বিশেষ করে অর্থাভাবে। ১৩০২ ত্রিপুরাব্দের (১৮৯২ খ্রিঃ) ১৯ নং প্রসিডিং এ বলা হয় যে " এ রাজ্যের প্রজাসংখ্যার তুলনায় বিদ্যালয় ও ছাত্রসংখ্যা নিতান্ত কম। রাজধানী ব্যতীত এ রাজ্যের সর্বত্রই নিম্নশ্রেণিস্থ লোকের বাস। উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহাদিগের অধিক নয়। তাহাদের অবস্থা ও অভাব অনুসারে সুপ্রণালীমতে গঠিত পাঠশালার শিক্ষাই প্রচুর হইবার কথা; অতএব উপযুক্ত প্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পাঠশালা স্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।" উপরোক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সে সময়ে একদিকে যেমন কিছু পাঠশালা চালু করা হয় অন্যদিকে তেমনই রাজধানীর বঙ্গ বিদ্যালয়ে প্রতিবছর কমপক্ষে আটজন পাঠশালার শিক্ষককে শিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ শ্রেণি খোলা হয়। প্রসিডিং এবলা হয় যে ঐ আটজনের মধ্যে দুইজন মণিপুরী, দুইজন ত্রিপুরী, দুইজন বাঙালি ও দুইজন কুকি - হালাম হওয়া চাই। শিক্ষণের মেয়াদ ধার্য হয় এক বৎসর। প্রাথমিক শিক্ষক মনোনয়নের ভার দেওয়া হয় যেখানে পাঠশালাআছে বা খোলা হবে সেখানকার জনসাধারণের উপর। মনোনয়ন প্রসঙ্গে অবশ্য এ কথাও বলা হয় যে অন্তত বুধোদয় পড়ে যারা বুঝতে না পারে তাদের যেন মনোনীত না করা হয়। মনোনয়নের পর নির্বাচনের দায়িত্বপালন করতেন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক। শিক্ষনীয় বিষয় ছিল উচ্চ বাংলা বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যক্রম ও সেইসঙ্গে কৃষিবিদ্যা ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়। [১]

পাঠশালার শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য দরকারমত বঙ্গবিদ্যালয়ে অনধিক কুড়ি টাকা বেতনে একজন অতিরিক্ত পণ্ডিত নিয়োগের ব্যবস্থাও অনুমোদিত হয়। ঐ প্রসিডিং থেকে আরও জানা যায় যে হবু শিক্ষকদের শিক্ষাকালীন ও শিক্ষান্তে স্বীয় গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করবার জন্য সরকারি বৃত্তি ধার্য ছিল পাঁচ টাকা। [২] ঐ বছরের ভাদ্র মাসে প্রচারিত শিক্ষাবিভাগ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে ফাল্গুন মাসে সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠশালার শিক্ষকদের একটি বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। আরও বলা হয় যে শুধু যে বেতন বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সমশ্রেনির কর্মচারীদের মধ্যে পরীক্ষোতীর্ণ শিক্ষকদের দাবী

অগ্রগণ্য হবে তা নয়, প্রথম বিভাজন উত্তীর্ণ শিক্ষকদের মধ্যে তিনজনকে যথাক্রমে পনের, দশ ও পাঁচ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। ৩ এই ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হয়েছিল বা এর ফলে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণে লোকেদের কতটা উৎসাহিত করেছিল তা অবশ্য উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে আমরা জানতে পারছি না।

ড. জগদীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিক্ষক শিক্ষণ প্রসঙ্গে একটি তথ্য দিয়েছেন। " ১৯১২-১৩ সালে (১৩২২ ত্রিং) প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সাহিত্য, অংক, শ্রেণি পরিচালনা ও পাঠদান পদ্ধতি এই চারটি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়। এই পরীক্ষায় পাশ না করলে শিক্ষকদের পদোন্নতি বা বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি হতে পারবে না বলেও আদেশ বেরিয়েছিল। অথচ প্রস্তুতি হিসাবে শিক্ষকদের কোচিং বা ট্রেনিং দেবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সে সময়কার শিক্ষকদের নিজেদের বিদ্যা ও প্রাথমিক স্তরের উর্দ্ধে ছিল না। দেখা গেল প্রথম বছরে পরীক্ষায় বসলেন বিশজন, পাশ করলেন চার জন। খুব সম্ভবত শ্রেণিপরিচালনা ও পাঠদান পদ্ধতি, যার আবার ব্যবহারিক পরীক্ষাও ছিল, সম্বন্ধে শিক্ষকদের নিজেদের মৌলিক চিন্তাধারা প্রকাশ করেই পাশ করে থাকবেন। বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার ফলে পরীক্ষাটি কিছুকাল চলেছিল। শেষ পর্যন্ত শিক্ষকদের অনীহাতে বন্ধ হয়ে যায়। [৪]

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য গুরু ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের ২১ শে কার্তিকের ৭নং সারকুলার অনুযায়ী। বলা হয় যে প্রতি বৎসর শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্বাচিত সংখ্যক শিক্ষক কুমিল্লার গুরু ট্রেনিং স্কুলে শিক্ষণ নিতে যেতে বাধ্য থাকবেন। তাদের ১লা জানুয়ারিতে স্কুলে যোগাদান করতে হবে । ট্রেনিং চলবে এক বৎসর কাল, ঐ সময়ে তাদের বিনাবেতনে বিদায় নিতে হবে কিন্তু ট্রেনিং কালের জন্য তারা মাসিক দশ টাকা হারে বৃত্তি পাবেন। বৎসরান্তিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে বা অন্য কোন কারণে পরীক্ষা দিতে অপারগ হলে বিশেষ কারণ ব্যতীত তাদের পুনরায় পড়বার অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাদের কার্যে রাখা না রাখা কর্তৃপক্ষের উপর নির্ভর করবে। কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের ভবিষ্যৎ উন্নতির বিষয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনা করবেন। উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ কার্যে যোগদান করে অন্তত পাঁচ বৎসর কাল বিভাগে কাজ করবেন এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ একটি এগ্রিমেন্টপত্র দাখিল করবেন। [৫]

১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ অর্থাৎ ১৯২৯-৩০ এর ঘটনা-রাজ্যের মধ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকলেও রাজ সরকার বাইরে পাঠিয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেবার চেষ্টা করছেন, এটা খবুই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তবে এ প্রচেষ্টা কতদূর সফল হয়েছিল এবং কতদিন পর্যন্ত বহাল ছিল তা সঠিকভবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না উপযুক্ত সাক্ষ্যের অভাবে। তবে গুরু ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক যে ত্রিপুরায় কর্মরত ছিলেন তা সত্য কেননা এরূপ একজন অতিবৃদ্ধ শিক্ষকের দেখা আমি পেয়েছি ১৯৫৩-৫৪ সালে গোলাঘাটি গ্রামে।

হাইস্কুলের স্নাতক শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বাইরে অবস্থিত ট্রেনিং কলেজে পাঠাবার উদ্যোগ নেয়া হয় ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দের তিন নম্বর সার্কুলারে। বলা হয় এ রাজ্যের জন্য ট্রেনিং কলেজে একটি স্থান রিজার্ভ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য ট্রেনিং কলেজের নাম উল্লিখিত হয়নি, জানা যায় যে

ঢাকা ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকদের পাঠান হত। ট্রেনিং কলেজে শিক্ষণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়। ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকদের ক্রমোন্নতির বিবেচনা এবং অণুত্তীর্ণদের উন্নতি বা অন্য প্রমোশনের ক্ষেত্রে রাণির সম্মুখীন হতে হবে। প্রতিবৎসর তিনজন শিক্ষককে মনোনীত করে ট্রেনিং কলেজে পাঠান হত। তারা সেখানে কলেজ কর্তৃক আয়োজিত নির্বাচনী পরীক্ষায় বসতেন এবং কলেজ কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক ট্রেনিং কোর্সে ভর্তি হবার সুযোগ পেতেন।
নয়মাস কালের জন্য ঐ শিক্ষককে পূর্ণ বেতনে বিদায় দেয়া হত। কিন্তু আর অন্য কোন ব্যয় পেতেন না। বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপ করলে, ঐ সময়ের জন্য তিনি সবেতন বিদায় পাবার অধিকার হারাবেন অধিকন্তু কার্যে বিচ্ছেদও গণ্য হতে পারে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষক রাজ্যের শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তত পাঁচ বৎসর কাল কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। ৬
১৩৪০ ত্রিপুরাব্দের ৯ই কার্তিকের ১৮৫১-৫৭ নম্বর অদেশে বলা হয়েছে যে ট্রেনিং কলেজ কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষক ট্রেনিং-এ গমনকালে কোন প্রকার পাথেয় পাবেন না কেবল মাত্র পূর্ণবেতনে বিদায় পাবেন কিন্তু শিক্ষকগমণ Admission test পরীক্ষা প্রদানকালে যাতায়াতের দরুণ প্রচলিত বিধান অনুসারে পাথেয় পাবেন। ৭
পাথে = T.A.D.A ইত্যাদি।
বিদায় = Leave, ছুটি।
কার্যেবিচ্ছেদ = termination of service.

১৩৫২ ত্রিপুরাব্দের তিন নম্বর সার্কুলার রাজ্যের হাইস্কুল শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বিষয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয়। আদেশে বলা হয় যে অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গ্র্যাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ইংরেজী , বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেজন্য রাজসরকার ও উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং গ্রহণ করা অপরিহার্য বিবেচনা করে বিভাগ থেকে শিক্ষক ট্রেনিং এর জন্য পাঠাবে। এরূপ প্রেরিত শিক্ষক নির্ধারিত ট্রেনিং কালের জন্য পূর্ণবেতন পাবেন এবং সে সময়ে সরকারি কাজে মোতায়েন বলে গণ্য হবেন কিন্তু মোতায়েনী এলাউন্স পাবেন না। অন্য কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য পাবেন না। ট্রেনিং পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে ট্রেনিং নির্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত সময় ব্যায় করলে, অতিরিক্ত সময়ের জন্য বেতনসহ বিদায় পাবেন। কিন্তু আবস্থা বিবেচনায় তাহার কাজের বিচ্ছেদ রূপে গণ্য হতে পারবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ সরকার নির্দ্ধারিত বেতনে অন্তত পাঁচ বৎসর কাল রাজ্যের শিক্ষা বিভাগে কাজ করতে বাধ্য থাকবেন। নির্বাচিত শিক্ষকগণ ট্রেনিং গ্রহণ না করলে তাদের ক্রমোন্নতি, সময়মত বেতনবৃদ্ধি ট্রেনিং গ্রহণ না করা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এবং তাদের কার্যের স্থায়িত্ব ও বিভাগের বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ হবে। ৮
কিন্তু একথা বলাবাহুল্য যে রাজ্যের হাইস্কুল শিক্ষকদের জন্য বি.টি.বা বিষয় ট্রেনিং এর ব্যবস্থা কার্যকরী করলেও খুবই অল্প সংখ্যক শিক্ষক এ সুয়োগ পেতেন। তবে পেতেন যে তাও ঠিক যদিও কোন সরকারি

পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকদের। কিন্তু লেখক সে সময়কার ত্রিপুরার হাইস্কুলের ছাত্র এবং তিনি নিজে সেরূপ বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বিটি পাশ শিক্ষকদের নিকট পাঠগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের সকলে চিনতো, তাঁরা সমাজে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন এবং বিটি মাস্টার বলে খ্যাত ছিলেন। ১৯৫৪ সালে আগরতলা বেসিক ট্রেনিং কলেজ স্থাপন করা হয় এবং সেখানে প্রাথমিক শিক্ষক (ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল পাশ) এবং মাধ্যমিক শিক্ষক (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাশ) স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের পুরো বেতন দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ যে প্রক্রিয়া ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯-৩০ খ্রিঃ) শুরু হয়েছিল তা ভারতরাষ্ট্রে যোগদানের পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি কার্যকারীরূপে শিক্ষাফলন ট্রেনিং কালে পুরো বেতন এবং কিছু ট্রেনিং ভাতাও পেতে থাকেন।

পাদটীকা

১। বন্দ্যোপাধায় সুপ্রসন্ন ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, আগরতলা, ১৯৭১ ভূমিকা পৃঃ ১০ (পরে গেজেট সংকলন)।

২। তদেব পৃঃ ১০।

৩। তদেব পৃঃ ১০।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায় জগদীশচন্দ্র ঃ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, পটভূমি, ভবিষ্যৎ দিগঙ্গনের নির্দেশ ঃ প্রবন্ধ সংখ্যা-১, গোমতী আগরতলা।

৫। গেজেট সংকলন পৃঃ ১৯৯।

৬। ৩ নম্বর সার্কুলার ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দ।

৭। ১৮৫১-৫৭ নং সার্কুলার , ৯ই কার্তিক ১৩৪০ ত্রিং।

৮। ৩ নম্বর আদেশ, ১৩৫২ ত্রিপুরাব্দ।

আদিবাসী শিক্ষা

Tribal Education তথা আদিবাসী শিক্ষা বলতে আজকাল আমরা যা বুঝি, রাজন্যশাসিত ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষাবিদদের এ ধারণা ছিল না। কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শাসক রাজন্যবর্গ নিজেদের আদিবাসী বলে স্বীকার করতেন না বরঞ্চ হস্তিনাপুর থেকে আগত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে উল্লেখ করতেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মধ্যে নানাজন গোষ্ঠীসম্ভুত বিভিন্ন জনজাতি থাকলেও ত্রিপুরার রাজাগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে প্রতিবেশী বঙ্গভাষী জনগণের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে রাজসরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা সূচনাকালে কিছু সংখ্যক পার্বত্য প্রজাদের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় সেজন্য আলাদা করে পার্বত্য ছাত্রদের কিছু আর্থিক সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্যই Tribal Education এর মূল বিষয় নয় এ তত্ত্ব তারা জানতেন না। উপজাতি অধ্যুষিত ত্রিপুরা রাজ্যে " পার্বত্য ছাত্রছাত্রী বুঝাইতে পার্বত্য ত্রিপুরা, কুকি, রিয়াং, লুসাই, মগ, চাকমা, গারো ইত্যাদি সমশ্রেণির সর্বপ্রকার এ রাজ্যবাসী ছাত্রছাত্রী বুঝাইবে। " [১] কিন্তু ঠাকুরদের আলাদা সমাজভুক্ত করে তাদের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায়। লস্কর সম্প্রদায় সমতলবাসী হয়েও পার্বত্য ত্রিপুরাদের মত সুযোগ সুবিধা পেত। এই রাজ্যের মণিপুরী সম্প্রদায়, যদিও তারা এখনও এই রাজ্যে বা মূল বাসভূমি মণিপুরে ভারত সরকার কর্তৃক উপজাতি হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি, ত্রিপুরী বা অন্য জনজাতির মতই অর্থনৈতিক সুবিধা পেত। এই নিবন্ধে ঠাকুর, পার্বত্য জনজাতি, মণিপুরী, রাজকুমার রাজকুমারীদের শিক্ষণ শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাপ্তব্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আলোচনা করা হচ্ছে।

ঠাকুর ঃ ঠাকুর সম্প্রদায়ের প্রতি রাজসরকারের বিশেষ দুর্বলতা বিভিন্ন সাক্ষ্যে দেখা গেছে। রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যে কলেজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে প্রশাসনিক বিবরণীতে বলা হয়েছে -" The Chief objecteir of the State in having a college of its own is to give higher education to the Thakur boys, who are the sons of the local nobles." [২] ঠাকুরগণ অভিজাত বংশের সন্তান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কাঁরা? এ বিষয়ে ত্রিপুর রাজবংশের বিখ্যাত সন্তান মহামান্যবর নবদ্বীপ চন্দ্র লিখেছেন "ত্রিপুর বা ত্রিপুরা রাজ্যের ঠাকুর রাজ্যের অভিজাত বংশ। দ্বাদশটি উচ্চতম পরিবার লইয়া ইহার আদি গঠন হয়। ক্রমে এই বীজকেন্দ্র পরিবেষ্টন করিয়া পরপর অনেক ভাঁজ (acciretion) পড়িয়া গিয়াছে। এই দ্বাদশটি মৌলিক ঠাকুর বংশ হইতে যাবতীয় রাজ্যশাসনের বিভাগের অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইত। তখনকার সাধারণ নীতি এই বিশিষ্ট পরিবার সকলের বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য [৩] অনুসরণ করিয়া সেই কার্য্যাধ্যক্ষের পদগুলি পরিবারানুগত করা হইয়াছিল। এই মৌরুসী অধিকারের নিয়ম থাকায়..... বহুপূর্বের ত্রিপুরাযুগের প্রভাতে যখন ত্রিপুর নরপতিরা দেশ ও সমাজ গড়িতেছিলেন তখন তাহাদের অধিকার বিস্তারের সহায় ছিলেন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজারা অতোধিক ক্ষুদ্র সনাথ পল্লীবাসীরা। .... ত্রিপুরার নরপতিরা যেমন একদিকে রাজ্যবিস্তার ও রক্ষার জন্য এই শক্তির পরিচালনা করিতেছিলেন তেমনই শাসন ও ব্যবস্থাপনাদির

জন্য অনুভব করিয়েছিলেন একটি নায়ক শ্রেণির প্রতিষ্ঠান কেননা মিলিত বিশ্বামিত্র বশিষ্ট শক্তি ছাড়া রাজত্ব জিনিসটার অচল প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর নয়।.... উপরে যাহারা উল্লেখ করিয়াছি নায়ক শ্রেণি বলিয়া তাহারাই ত্রিপুরার নরপতিগণের অধিকতর সমীপবর্তী পরিবেষ্টনে দাঁড়াইয়া গেল। তাহারাই হইলেন ত্রিপুরা রাজ্যে ঠাকুর ত্রিপুরা দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি।" [৩] মহামান্যবরের এই তত্ত্ব নিশ্চয়ই তাঁর খুড়া মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য যিনি ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম জনসাধারণের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং খুড়তুতু ভাই মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁর বংশধরগণ বিশেষ ভালভাবেই জানতেন। সেজন্যই তাঁরা সকলে ঠাকুরদের শিক্ষার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করেছিলেন অবশ্যই তাঁদের সাধ্যের মধ্যে।

ঠাকুর লোকদের বালকদের শিক্ষিত করার প্রয়াসে প্রথমে রাধাকিশোর মাণিক্য বিশেষ উদ্যোগ নেন। রাজ্যের স্কুলগুলিতে পড়ার জন্য তাদের কোন বেতন দিতে হত না। সে সময়ে রাজ্যের একমাত্র হাইস্কুলে ঠাকুর বালকদের পড়ার জন্য কোন বেতন লাগত না বরং প্রতিমাসে তাদের ৪-৫ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া হত। স্কুলে বিনাবেতনে অধ্যয়ন ও মাসিক স্কুল বৃত্তি রাজকীয় আমলের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। [৪] রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে ম্যাট্রিক পাশ ঠাকুর ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে কুমিল্লা ও কলকাতার কলেজে পড়ার ব্যবস্থাও করেছিল রাজসরকার এবং পরেও তা কার্যকরী ছিল। [৫] রাজ্যে কলেজ স্থাপনের পরে "মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে" যে সব এরাজ্যবাসী মহারাজ কুমার....ঠাকুরলোক ... অধ্যয়ন করিবে তাহারা তথায় ফ্রি স্টুডেন্টশিপ প্রাপ্ত হইবে।" ৬ এই ঘোষণা ১০ই আশ্বিন ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের।

এসব সুবিধা ছাড়াও যোগ্য প্রার্থী প্রার্থনা করলে কয়েকটি বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হত। তার মধ্যে ঠাকুর পরিবারস্থ ম্যাট্রিকুলেশান উত্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য ২৫্ টাকার ২টি ও ২০্ টাকার দুইটি বৃত্তি। এম.ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঠাকুর পরিবারস্থ ছাত্রগণের জন্য ৫্ টাকার ৪টি বৃত্তি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। কিন্তু যে সব ঠাকুর বালক আগরতলাস্থ ঠাকুর বোর্ডিং এ থেকে পড়াশোনা করছিল তাদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিশেষ বৃত্তি প্রযোজ্য ছিল না। ৭

রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে ঠাকুর বালকদের জন্য বিশেষ বোর্ডিং হাউস তৈরি হয় আগরতলা শহরে। বোর্ডিং এ থাকা ও খাওয়ার খরচ বহন করত রাজ সরকার। তদুপরি উৎসাহ দানের জন্য মাসিক ৪-৫্ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হত। ১৯০২-০৩ সালে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়ে ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১৯০৩-০৪ সনে স্বয়ং উজীর সাহেব কমিটির প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হন। রাধামোহন ঠাকুরও বোর্ডিং এর গভর্ণর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঠাকুর বোর্ডিং শুরু হয়েছিল ১৩ জন আবাসিকদের নিয়ে এবং রাজকীয় আমলের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকে। ঠাকুর বোর্ডিং এ একজন ম্যানেজার, একজন টিউটর ড্রিল শিক্ষক, একজন এসিটেন্ট টিউটর এবং সর্বোপরি একজন গ্র্যাজুয়েট সুপারিটেনডেন্ট টিউটর কাজ করতেন। ১৩৩৬ ত্রিং ২৫ শে বৈশাখ তারিখে ঠাকুর বোর্ডিং এর জন্য একজন রেসিডেন্ট টিউটর ৪০-২-৬০ টাকা বেতনে দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি দেখা যায়। অন্যান্য বোর্ডিং হাউসের মত আগরতলাস্থ ঠাকুর বোডিং এ পাক্ষিক একবার সুশিক্ষিত ডাক্তার দ্বারা

স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবার ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায়। [৮] বিশেষ মান্যগণ্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা ঠাকুর বোর্ডিং পরিদর্শন করান হত। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের উৎসাহিত করা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, নাটোরের মহারাজা, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ঐসব মান্য বক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন। এতসব বিশেষ ব্যবস্থা

ঠাকুরদের প্রগতি (১৩৩৩-১৩৫৫ ত্রিং) সারণী -ক [৯]

বর্ষ-ত্রিং-সন	স্কুলে পাঠরত ছাত্র সংখ্যা	বোর্ডিং এ আবাসিক ছাত্র সংখ্যা	রাজ্যের বাইরে অবস্থিত কলেজে পাঠরত ছাত্রসংখ্যা	মন্তব্য
১৩৩৩	১৮১	৩৫	৯	
১৩৩৪	১৬৬	৩৫	৯	
১৩৩৫	১৭৯	৩৫	৮	বিখ্যাত আইনবিদ রাজনীতি ও বীরচন্দ্র দেববর্মা ঢাকা আইন কলেজে পড়তেন।
১৩৩৬	১৮০	৩৫	৮	
১৩৩৭	১৭০	৩৫	৯	
১৩৩৮	১৭৬	৩৪	১১	
১৩৩৯	৩২৪	৩৫	১২	
১৩৪০	১২২	২৯	কতিপয়	সংখ্যা বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।
১৩৪১	১৬৩	২৮	কতিপয়	সংখ্যা বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।
১৩৪২	২১৩	২৮	কতিপয়	সংখ্যা বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।
১৩৪৩	২৮২	৩২	১২	
১৩৪৪	২৯০	৩২	৯+২	১জন মহিলা বীনা দেববর্মা কলেজে পড়তেন।
১৩৪৫	২১৬	৩০	১০	
১৩৪৬	২০৩	২৮	কতিপয়	সংখ্যা বিবরণীতে উল্লেখ করা হয়নি।
১৩৪৭	৩২০	৩০	১৪	
১৩৪৮	২৭৯	২৪	১৯	
১৩৪৯	৩৭০	২৪	১৩	
১৩৫০	৩০৩	৩০	১৩	
১৩৫১	২৬১	২০	১০	
১৩৫২	২৫৪	১৭	১২	
১৩৫৩	২৫৪	১৭	১২	
১৩৫৪	২৭৫	১৭	১১	
১৩৫৫	২৮৩	১৮	১৩	

করে রাজ সরকার ঠাকুরদের কতটা উন্নতি করতে পেরেছিলেন, রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বর্ষের খতিয়ান নিম্নে সারণীতে উদ্ধৃত তা উপলব্ধি করা যাবে।

পার্বত্য প্রজা ঃ পার্বত্য প্রজা বোঝাতে রাজসরকার ত্রিপুরী, রিয়াং, কুকি, মগ, চাকমা, গারো, লুসাই, খাসিয়া, হালাম প্রভৃতি জনজাতির উল্লেখ বারবার গেজেটেয়ার এ করেছে। তাদের শিক্ষার ব্যাপারে রাজসরকার অর্থসাহায্যমূলক নানাপ্রকার বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। নিম্নে বিভিন্ন বৃত্তির কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

" পার্বত্য বৃত্তি " ঃ এই বৃত্তির বিষয়ে সর্বপ্রথম যে ঘোষণাটির সন্ধান পাওয়া যায় তা হচ্ছে ১৩০৭ ত্রিং সনের ১৬ই বৈশাখ তারিখের প্রচারিত মেমো। এই মেমোতে পর্বতবাসী জাতিগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে " পার্বত্য বৃত্তি" নামে মাসিক ৫ টাকার কয়েকটি বৃত্তি স্থাপন করা হয়। ছাত্ররা আগরতলায় এসে বাস করলে এবং স্কুলে পড়লে ঐ বৃত্তি পেত। কিন্তু যেহেতু পার্বত্য ছাত্ররা বাড়ি ছেড়ে দূরে বাস করতে চাইত না সেজন্য এই প্রচেষ্টা খুব একটা সফল হয়নি। সেজন্য ১৩১৩ ত্রিং সনের ২২ শে পৌষ ১৪ নং মেমোদ্বারা ঘোষণা করা হয়, " আগরতলা পুরাতন হাবেলী এবং প্রত্যেক ডিভিসনের উপরে স্থাপিত স্কুলে যে সকল পার্বত্য ছাত্র পাঠ করিবে তাহাদিগকেও পার্বত্য বৃত্তি দেয়ার জন্য মন্ত্রীমহোদয়ের অভিপ্রায়। ১০ কারণ পার্বত্য লোকেরা বাড়ি ছেড়ে দূরবর্তী স্থানে যেতে অনিচ্ছুক সেজন্য সদর ও তার কাছাকাছি অঞ্চল ব্যতীত অন্য এলাকার ছাত্ররা আগরতলায় আসত না।

পার্বত্য বালক বালিকাদের পুরস্কার পরীক্ষা ঃ ' বিগত ১৩২২ ত্রিং সনের ৭ই আশ্বিন তারিখে নিম্নবাঙলা স্কুলের ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির এবং পাঠাশালার ২য় ও ৩য় শ্রেণির বর্তমান সনের পাঠ্যতালিকায় ৬ষ্ঠ শ্রেণি ও ৭ম শাকা এ রাজ্যেরানী মণিপুরী মন এবং ত্রিপুরা কুকি রিয়াং, প্রভৃতি যাবতীয় পার্বত্য বালক বালিকাগণের পুরস্কার সংক্রান্ত সারকুলার প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত দুই শ্রেণির পরীক্ষা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম পরীক্ষা নামে অভিহিত হইবে। " ১১ পাঠ্যবিষয় বলা হয়েছে সাহিত্য-আবৃত্তি, শব্দার্থ, শ্রুতলিপি, হস্তলিপি ও অন্যবিধ সহজ প্রশ্ন। এছাড়া বুদ্ধি ও সাধারণ অভিজ্ঞতা পরীক্ষার জন্য পার্বত্য জাতির প্রয়োজনীয় কাজ (কৃষি, জুম প্রভৃতি) সম্বন্ধে সহজ প্রশ্ন। অঙ্ক ঃ পাটিগণিত ও ধারাপাত। পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যাংশ বর্তমান সনের পাঠ্যতালিকায় বাংলা পাঠ্যের অনুরূপ। ধারাপাত বালকদের জন্য-প্রথম পরীক্ষা কড়া, গণ্ডা, বুড়ি ও পণকিয়া। নামতা ১৩ এর ঘর পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরীক্ষা কড়া, গণ্ডা, বুড়ি, পণকিয়া ,কাচ্চা, ছটাক, পোয়া, সের ও মনকিয়া। নামতা ২০ ঘর পর্যন্ত। বালিকাদের জন্য প্রথম পরীক্ষা বড় কিয়া ও গন্ডাকিয়া। দ্বিতীয়ী পরীক্ষা কড়া, গন্ডা, বুড়িও পণকিয়া। নামতা ১০ ঘর পর্যন্ত। পুরস্কার ঃ উত্তীর্ণ বালকবালিকার শিক্ষককে ৫ আনা, উত্তীর্ণ বালকবালিকাদের চার আনা এবং দ্বিতীয় পরীক্ষায় সাতআনা, ছয় আনা পুরস্কার দেওয়া হবে। ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে " স্বীয় শিক্ষাধীন পরীক্ষায় উপস্থিত প্রতি ৫ জন পরীক্ষার্থীর জন্য শুধু বালক ও শুধু বালিকা কিংবা বালক বালিকা যোগে) সংশ্লিষ্ট শিক্ষক। আটআনা হিসাবে পুরস্কারপ্রাপ্ত হইবেন। " [১২] যেসব বালক বালিকা সর্বমোটের এক চতুর্থাংশ নম্বর পাবে না, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তাদের জন্য কোন পুরস্কার পাবেন না।

বিশেষ বৃত্তি ঃ মধ্যস্তরের উপরে কোন পার্বত্য ছাত্র উঠিলে বা ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করলে তাদের বিশেষ বৃত্তি দেয়া হত। ম্যাট্রিকুলেশান পাশদের জন্য ২৫ টাকার ২টি এবং মধ্য ইংরেজি ওপরে পাঠকারী বালকবালিকাদের জন্য ৫ টাকার ২টি এবং ৩ টাকার দুইটি বৃত্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। [১৩]

বিনাবেতনে অধ্যয়ন ঃ পার্বত্য প্রজাদের বিদ্যালয়ে পড়তে গেলে কোনও বেতন দিতে হত না। এই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে শুরুর সময় থেকেই চালু ছিল। পরে বিদ্যালয়ে বেতন আদায় প্রথা চালু হলেও পার্বত্যপ্রজা ও রাজ্যে স্থায়ী বসবাসকারী মণিপুরী প্রজাগণও বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগপ্রাপ্ত হইবে। [১৪]

কলেজে বিনাবেতনে অধ্যয়ন ঃ রাজ্যে কলেজ প্রতিষ্ঠার পর রাজ্যবাসী পার্বত্য প্রজাদের মহারাজা বীরবিক্রম কলেজে বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়া হত — " আদেশ করা যায় যে 'মহারাজ বীর বিক্রম কলেজে ' যে সব রাজ্যবাসী মহারাজ কুমার ... ত্রিপুরা, লস্কর ও পার্বত্য প্রজা (কুকি, রিয়াং প্রভৃতি ও হালামগণ) অধ্যয়ন করিবে তাহারা তথায় 'ফ্রি স্টুডেন্টশিপ' প্রাপ্ত হইবে।" [১৫]

স্পেশাল স্টাইপেন্ড ঃ এছাড়া রাজ্যের বাইরে অবস্থিত কলেজে পড়াশোনা চালাবার জন্য পার্বত্যজাতি সমূহের ছাত্রদের স্পেশাল স্টাইপেন্ড নামে এক প্রকার বৃত্তি দেয়া হত। এ সুযোগ অবশ্য কিছু মণিপুরী

সারণী-খ [১৬]

বর্ষ ত্রিং	বৃত্তিপ্রাপকের	মন্তব্য	বর্ষ	বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা	মন্তব্য
	সংখ্যা				
১৩৩৫	৮	৫ জন মনিপুরী	১৩৪৭	৩০	"
১৩৩৬	৮	৩ জন মনিপুরী	১৩৪৮	২৭	"
১৩৩৭	৭	১ জন মনিপুরী	১৩৪৯	২৫	"
১৩৩৮	১০	৪ জন মনিপুরী	১৩৫০	১৪	"
১৩৩৯	৩১	মনিপুরী	১৩৫১	১৫	"
১৩৪১	২৩	দেখান	১৩৫২	১৪	"
১৩৪২	৩০	হয়নি	১৩৫৩	১৩	"
১৩৪৩	১৭	"	১৩৫৪	১২	"
১৩৪৪	১৯	"	১৩৫৫	১৬	"
১৩৪৫	২০	"			
১৩৪৬	৩০	"			

ছাত্রও পেয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় প্রথমে তালিকাডে মণিপুরী উল্লেখ থাকলে ও পরবর্তী সময়ে কেবলমাত্র মোট সংখ্য। দেখান হয়েছে। নিম্ন সারণী বিষয়টি পরিস্কার করবে।

সারণীতে উল্লিখিত তথ্যানুসারে ২১ বছরে মোট ৩৩৬ জন ছাত্র এই বিশেষ বৃত্তির সুযোগ পেয়েছিল।

লুসাই স্টাইপেন্ড ঃ রাজসরকার রাজ্যের মধ্যে বা রাজ্যের বাইরে অবস্থিতত হাইস্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত লুসাই ছাত্রদের লুসাই স্টাইপেন্ড নামে এক প্রকার বৃত্তি প্রদান করত। প্রাপ্ত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, ১৩৪৩ ত্রিং সনের ৩ জন স্টাইপেন্ড পেয়েছিল যার মধ্যে একজন রাজ্যের হাইস্কুলে এবং অন্য দুইজন বাইরের হাইস্কুলে পড়ত। ১৩৪৪ ত্রিং সালের ৩ জন স্টাইপেন্ড প্রাপকদের মধ্যে ২জন শ্রীহট্টের মুরারী চাঁদ কলেজে এবং ১ জন ময়নামতী , কুমিল্লাতে অধ্যয়ন করত। ১৩৪৫ ত্রিং সনের ৪ জন লুসাই বৃত্তি পেয়েছিল যার মধ্যে ১ জন কুমিল্লারে ভিক্টোরিয়া কলেজে, একজন ময়নামতীতে এবং ২ জন শ্রীহট্টের মুরারী চাঁদ কলেজে পড়ত। ১৩৪৬ ত্রিং সনে মোট বৃত্তি প্রাপকের সংখ্যা ৫ যার মধ্যে ১ জন ভিক্টোরিয়াতে বি.এ পড়ত, ১ জন কোলকাতায় এম.এ. পড়ত এবং ৩ জন রাজ্যের স্কুলে পড়ত। ১৩৪৭-১৩৪৯ ত্রিং সনে প্রাপকের সংখ্যা যথাক্রমে ৫৬ এবং ৯জন। ১৩৫০-১৩৫২ ত্রিং সনে প্রাপকের সংখ্যা ১২, ২৩ এবং ২৫ জন । ১৩৫৩-১৩৫৫ ত্রিং সনে প্রাপকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪,১৭

এবং ১৮ জন। উপরোক্ত কয়েক বছরে কে কোথায় পড়ত প্রশাসনিক বিরণীতে তার উল্লেখ নেই।

সংরক্ষিত পার্বত্য ছাত্র বৃত্তি ঃ ১৩৫৮ ত্রিপুরাব্দের ৮নং সারকুলার দ্বারা সংরক্ষিত পার্বত্য ছাত্রবৃত্তি ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্বে বার্ষিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বসে পার্বত্য ছাত্রছাত্রীরা বৃত্তি পাবার মত স্থান পেলে বৃত্তি পেত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। কারণ মাতৃভাষা বাংলা না সারনী-গ [১৭]

বৃত্তির প্রকার	বৃত্তির সংখ্যা মাসিক	বৃত্তির হার	মন্তব্য
মাইনর	১	জনপ্রতি মাসে ৫ টাকা	পরীক্ষায় উতীর্ণ সব প্রথম বালক বালিকা
নিম্নবাংলো	২	জন প্রতি মাসে ৩ টাকা	বালকদের মধ্যে ১মও ২হয় এর জন্য
	১	জন প্রতি মাসে ৩ টাকা	বালিকাদের মধ্যে সর্বপ্রথমের জন্য
পাঠশালা	৩	জন প্রতি মাসে ২ টাকা	বালকদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় এর জন্য
	২	জন প্রতি মাসে ২ টাকা	বালিকাদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় এর জন্য

হাওয়ায় বাংলাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে সকল শ্রেণীর পার্বত্য ছাত্রছাত্রী সুবধি করতে পারত না। সেজন্য পার্বত্য ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধীয় ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দের আইন সংশোধন করে " সংরক্ষিত পার্বত্য ছাত্রবৃত্তি" ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু উল্লেখ্য যে যেসব পার্বত্য ছাত্রছাত্রী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান অধিকার করে বৃত্তি পেলে তাঁর সংরক্ষিত বৃত্তি পাবে না বলে ঘোষণায় বলা হয়।

বিশেষ বোর্ডিং হাউস ঃ আদিবাসী বালকদের জন্য রাজসরকার রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে **ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস চালু করে ১৩৩৫** ত্রিং সনে। এই বোর্ডিং এ ১৩৩৫ ত্রিং সনে ১০ জন আবাসিক একজন সুপারিটেনডেন্ট টিউটরের অধীনে বাস করত। আবাসিকদের বোর্ডিং এ আহার ও থাকার খরচ বহন করত রাজ সরকার। ১৩৩৬ ত্রিং সনে খোয়াই এম.ই. স্কুলে আরও একটি বোর্ডিং হাউস খুলতে রাজ সরকার আগ্রহী হয়। রাজসরকার টিউটর, পাচক ও প্রাইভেট টিউটর দিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করে। জনগণ কিছু তহবিল তৈরি করার পর রাজসরকারের বাস্তুবিভাগ এক তৃতীয়াংশ খরচ বহন করে। হোস্টেল বোর্ডিং চালু হয় ১৩৩৮ ত্রিং সনে। ১৩৩৯ ত্রিং সনের খোয়াইতে দুইজন টিউটর নিযুক্ত হয়। ১৩৪২ ত্রিং সালে আগরতলাতে বোর্ডিং লাইব্রেরী চালু হয় এবং বোর্ডিং সংলগ্ন জমিতে ছেলেদের কৃষিকাজে উৎসাহিত করা হয়। ১৩৪৩ ত্রিং সালের আগরতলাতে নিম্ন শ্রেণিগুলির ছাত্রদের জন্য আরও একটি ছাত্রাবাস তৈরি করা হয়। ১৩৪২ ত্রিং সালে খোয়াইতে আরও একজন টিউটর যোগদান করে। এ ছাড়াও রাজ্যে আরও বোর্ডিং হাউস ছিল যেগুলি রাজসরকারের খরচে চলত। এইসব বোর্ডিং হাউসের মধ্যে লস্কর বোডিং হাউস, আগরতলা,মণিপুরী বোর্ডিং হাউস, খোয়াই, কুকি রাজকুমার বোর্ডিং হাউস আগরতলা,ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস, ধর্মনগর, ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউস উদয়পুর, স্কুল বোর্ডিং হাউস, সোনামুড়া , স্কুল বোর্ডিং হাউস কৈলাসহর, হিন্দু বোর্ডিং হাউস এবং মুসলিম বোর্ডিং হাউস, বিলোনিয়া উল্লেখযোগ্য। ১৮ সোনামুড়া ও কৈলাসহর স্কুল বোর্ডিং হাউসে পার্বত্য ছাত্র থাকতে পারত। কিন্তু বিলোনিয়াতে হিন্দু বোর্ডিং হাউসে পার্বত্য ছাত্র থাকলেও সম্ভবত মুসলিম বোর্ডিং হাউসে কোন পার্বত্য ছাত্র থাকত না।

২.১২.৪০ ত্রিং সনে রাজসরকার আগরতলাস্থ ত্রিপুরা বোর্ডিং হাউসে ছাত্র ভর্তি করার ফলে অভিভাবক থেকে একবার নামা বা এগ্রিমেন্ট গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে রাজ সরকার ঐকান্তিক কামনা করে প্রতিটি ছাত্র, যাদের জন্য সরকার মাথাপিছু বার্ষিক ১২৫ টাকা খরচ করে, যেন ছাত্রাবাসে বাস করে ম্যাট্রিক পাশ করে কিন্তু দেখা গেছে মাঝপথে অনেক ছাত্র নানা কারণে স্কুল ছেড়ে চলে যায়। সেজন্য আইনে বলা হয়েছে এরূপ ঘটলে অভিভাবক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। [১৯] ১৩৫৮ ত্রিং সনের ১৩ই ভাদ্র ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আগরতলাতে এলে আগরতলা কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁকে ১১১১ টাকার একটি তোড়া উপহার দেয়া হয়। ডাঃ ঘোষ উক্ত অর্থ পবর্তবানী

সারণী-ঘ (বিশেষ বোর্ডিং হাউসে আবাসিকের সংখ্যা)

সন ত্রি	আগরতলা আবাসিক সংখ্যা	সন ত্রিং	খোয়াই	মন্তব্য
১৩৩৫	১০			
১৩৩৬	১০			
১৩৩৭	১০			
১৩৩৮	১০+৪ (অস্থায়ী)	১৩৩৮	১৪ রামকুমার	
১৩৩৯	১৮	১৩৩৯	১৪	
১৩৪০	১৮	১৩৪০	৩২	
১৩৪১	১৭	১৩৪১	৪১	
১৩৪২	১৮	১৩৪২	৪৭ ৩২	
	৪র্থ ১ম-৩য়	১৩৪৩	৬১ ৩৩	
১৩৪৩	১৬ ৩৩	১৩৪৪	৬০ ৫২	
১৩৪৪	১৬ ৩৫	১৩৪৫	৪৬ ৪০	
১৩৪৫	১৭ ৩১	১৩৪৬	৬০ ৫২	
১৩৪৬	১৬ ১৯	১৩৪৭	৬০ ৩০	১৩৪৬এৰ পরে কি
১৩৪৭	৩৫	১৩৪৮	৪১ ৩৪	১ম-৩য় শ্রেণির বোর্ডিং
১৩৪৮	২৭	১৩৪৯	৫৫ ৪৪	বন্ধ হয়ে পেছন কিংবা
১৩৪৯	৩৩	১৩৫০	৫৩ ৫৩	৪র্থ-দশম শ্রেণি সহ
১৩৫০	৩১	১৩৫১	৪০ ৫২	একই আবাশ চলত
১৩৫১	২৪	১৩৫২	৪৯ ৫২	তা জানা যায়নি।
১৩৫২	২৩	১৩৫৩	৫১ ৫৩	
১৩৫৩	২৮	১৩৫৪	৫২ ৫১	
১৩৫৪	১৮	১৩৫৫	৪৮ ৪৯	
১৩৫৫	১৯			

ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের জন্য রাজ্যের মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করেন। মন্ত্রী কর্তৃক প্রাপ্তি স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলেও ঐ অর্থ পার্বত্য হোস্টেল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে কিনা জানা যায় না। ২০ নিম্নের সারণী

সারণী-৬ (বিদ্যালয় পার্বত্য ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির সংখ্যা)

সন ত্রিং	ত্রিপুরী	রিয়াং	কুকি	চাকমা	লুসাই	খৃস্টান	গারো	অন্যান্য
১৩৩৩	৫৯৩	৪৮	২৬	-	-	-		১৪৩
১৩৩৪	৪৬৩	২৯	৬৬	-	-	-		৪৯
১৩৩৫	৫০০	২৮	১২	৯	২৭	-		৪২
১৩৩৬	৫৮৩	৩০	৪২	১২	২১	-		৪৭
১৩৩৭	৭৩২	২২	২৫	২	-	-		৮৪
১৩৩৮	৭৫৩	৪২	১৮	-	-	-		৮৮
১৩৩৯	৬৭১	১৪	২	-	৫	-		৬৩
১৩৪০	১২৪১	১০	-	-	৪	৩		১৫২
১৩৪১	১৩০০	৩১	৪১	১	৫	-		৪১
১৩৪২	১০৫৩	-	১	২	১	-		৯৬
১৩৪৩	৯৭৭	১৩	১	১	১	-		৪৪
১৩৪৪	১০০৭	১৮	-	-	১	-		৫৬
১৩৪৫	৯৮৫	৯	-	১	-	২		১২১
১৩৪৬	৯১৭	৯	-	১	১	৫		১১২
১৩৪৭	৯৮৩	২০	-	২	৩	-		১৫৩
১৩৪৮	৮৪৫	১৯	১	১	৬	-		১৩৯
১৩৪৯	১০২৩	৩৯	১	৩	৬	১০		২৩৯
১৩৫০	১১০৪	৪৫	১৭	৪	১২	-		১০৮
১৩৫১	১১০২	২৯	২৫	৩	২	৮	১০	১০৭
১৩৫২	৯৫১	৩৪	৫	৩	২৪	-	৫	৬৯
১৩৫৩	৮২০	১৭	৫	৩	১৪	২	-	৮০
১৩৫৪	৯৬৬	২৬	৪	-	১৭	-	৩	৮৬
১৩৫৫	৯৭৩	২১	৪	-	১৯	২	-	৮৬

থেকে রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বছরে রাজ্যের বোর্ডিংগুলিতে কতসংখ্যক পার্বত্য ছাত্র বাস করে লেখাপড়া করত তা জানা যাবে।

সাহায্যের ফলাফল ঃ এবারে দেখা যাক উপরোক্ত সুযোগসুবিধা প্রাপ্ত হবার ফলে বিদ্যালয়ে পার্বত্য ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি কি রূপ ছিল। রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বছরের সংগৃহীত উপাত্তসমূহ সারণীতে প্রদর্শিত হল।

সারণীতে দেখা যায় রাজ্যে প্রথম খ্রিস্টান ছাত্রের আবির্ভাব ১৩৪০ ত্রিং সনে। তার পূর্বেও লুসাই, কুকি, রিয়াং, প্রভৃতি ছাত্র ছিল বিশেষ করে লুসাইদেরও খ্রিস্টান ধর্মে ফেলা হয়নি। গারোদের বিদ্যালয়ে আসার তারিখ ১৩৫১ সাল। এখানে বেশ কিছু আদিবাসী প্রদর্শিত হলেও অন্যান্য বলতে রাজসরকার কি বোঝাতে চেয়েছেন জানা যাচ্ছে না। এই অন্যান্যরা নিশ্চয়ই অন্য উপজাতি কেনানা বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা বিবরণীগুলিতে স্বতন্ত্রভাবে দেখান হয়েছে।

মণিপুরী ঃ ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মণিপুরী জনগণ পার্বত্য শ্রেণিভুক্ত প্রজা বলে গণ্য হত না। " পার্বত্য প্রজা বলিতে এ রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলের সমস্ত রিয়াং, কুকি, চাকমা, গারো, লুসাই, ত্রিপুরা, মগ, খাসিয়া,নাগা বা হালামদিগকে পার্বত্য প্রজা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।" [২১] কিন্তু মণিপুরী বালক বালিকাগণ অন্যান্য উপজাতি বা পার্বত্যজাতির মত বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করত। মণিপুরী ছাত্রছাত্রীদের উপলব্ধ সুবিধাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল।

বিনাবেতনে অধ্যয়ন ঃ মণিপুরী সম্প্রদায়ের সকল বালক বালিকা স্কুলের সকল শ্রেণিতে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পেত। ১৩৩৯ ত্রিং সনের ১নং সারকুলারে এই তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এই সার্কুলার হাইস্কুলের ৩য় শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মণিপুরী ছাত্রদের স্কুলের বেতন 'ফ্রি' বলে ঘোষণা করা হয়েছে। [২২] পুনরায় ১৩৫৫ত্রিং সনের ৪নং সার্কুলারে বলা হয়েছে যে Sons of Maharajkumars...Manipuris...and all tribes of the state will continue to enjoy the privelege of free studentship as usual." [২৩] কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফিস ও অনুপস্থিতির জরিমানা বহাল রাখা হয়েছিল।

বিশেষ পুরস্কার পরীক্ষা ঃ পার্বত্য বালকবালিকাদের জন্য নির্দ্ধারিত পুরস্কার পরীক্ষায় মণিপুরীদেরও সুযোগ দেয়া হত। " বিগত ১৩২২ ত্রিং সনের ৭ই আশ্বিন তারিখে নিম্নবাংলা স্কুলের ৪র্থ ও ৫ম (ক) শ্রেণির এবং পাঠশালার ২য় ও ৩য় শ্রেণির (বর্তমান সনের পাঠ্য তালিকার ৬ষ্ঠ শ্রেণি ও ৭ম শ্রেণি (ক) শাখা ওরাজ্যবাসী মণিপুরী , মগ এবং ত্রিপুরা, কুকি, রিয়াং প্রভৃতি যাবতীয় পার্বত্য বালক বালিকাগণের পুরস্কার সংক্রান্ত সারকুলার প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে পরীক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইবে এবং উক্ত দুই শ্রেণির পরীক্ষা যথাক্রমে দ্বিতীয় ও প্রথম পরীক্ষা নামে অভিহিত হইবে।" [২৪] নিয়মাবলী, পুরস্কারের পরিমাণ, ব্যাপ্তি, শিক্ষকদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কার পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

স্পেশাল স্টাইপেন্ড ঃ রাজ্যের অবস্থিত স্কুলে বা বাইরের কলেজে অধ্যয়নরত পার্বত্য ছাত্রদের স্পেশাল স্টাইপেন্ড নামে একপ্রকার বৃত্তি দেওয়া হত। এ বৃত্তির তালিকায় প্রাপকদের মধ্যে কতিপয় মণিপুরী ছাত্রের নাম দেখা যায়। ১৩৩৫ ত্রিং সনে চন্দ্রহাস সিংহ, রাজকুমার দমনজিৎ সিংহ, নিতাই সিং, বাবু চাঁদ সিংহ নবদ্বীপ সিংহ ও বৃত্তি পেয়েছিলেন। ১৩৩৬ ত্রিং সনে চন্দ্রহাস, বাবুচাঁদ ও নবদ্বীপ সিংহ, ১৩৩৭ ত্রিং সনে চন্দ্রহাস এবং ১৩৩৮ ত্রিং সনে চন্দ্রহাস, বাবুচাঁদ, নবদ্বীপ ও কুলেশ্বর সিংহ এই বৃত্তি পেয়েছিলেন। তারপরে বৃত্তির মোট সংখ্যা উল্লেখ করলেও বিবরণীগুলিতে স্বতন্ত্ররূপে মণীপুরীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

রাজ্যের কলেজে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ ঃ মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ স্থাপিত হবার পরে উক্ত কলেজে

মণিপুরী ছাত্রছাত্রীদের বিনাবেতন পড়তে দেয়া হত। " আদেশ করা যায় যে মহারাজ বীরবিক্রম কলেজে যে সব রাজ্যবাসী মহারাজকুমার ... মণিপুরী...পার্বত্য প্রজা (কুকি, রিয়ং প্রভৃতি হালামগণ)

সারণী-চ

বর্ষ ত্রি	বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী	বর্ষ ত্রিং	বিদ্যালয়ে ছোট ছাত্রছাত্রী
১৩৩৩	৭৯৩	১৩৪৪	৫৭৩
১৩৩৪	৬৩৫	১৩৪৫	৭০৪
১৩৩৫	৫৭৮	১৩৪৬	৬৯৭
১৩৩৬	৬১৪	১৩৪৭	৬৭৩
১৩৩৭	৬১১	১৩৪৮	৮২৫
১৩৩৮	৬৬০	১৩৪৯	১২২০
১৩৩৯	৫৭৪	১৩৫০	১০৯৫
১৩৪০	৬৩৯	১৩৫১	৬২৭
১৩৪১	৭৪৪	১৩৫২	৮৬৩
১৩৪২	৬৩৪	১৩৫৩	৮১০
১৩৪৩	৫৬৮	১৩৫৪	৮২৩
		১৩৫৫	৮৫৬

অধ্যয়ন করিবে তাহাড়া তথায় ফ্রিস্টুডেন্টশিপ প্রাপ্ত হইবে। " [২৫]

বিশেষ বোর্ডিং হাউস ঃ মণিপুরী ছাত্রদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য খোয়াইতে একটি মণিপুরী বোর্ডিং হাউস তৈরি করেছিল রাজসরকার। অন্যান্য বোর্ডিং হাউসের মত সেখানেও আবাসিকদের থাকা ও খাবার খরচ রাজসরকার বহন করত। কিন্তু সেখানে বিশেষ টিউটর নিযুক্ত হয়েছিল কিনা তা সাক্ষ্যের

সারণী-ছ (বাধ্যতা মূলক প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে মণিপুরী ছাত্রছাত্রী)

সন ত্রিং	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	সন ত্রিং	ছাত্রছাত্রী সংখ্যা	মন্তব্য
১৩৪২	১	১৩৫০	৬	
১৩৪৩	৪	১৩৫১	১০	
১৩৪৪	১০	১৩৫২	৭	
১৩৪৫	-	১৩৫৩	১৩	
১৩৪৬	৬	১৩৫৪	১৩	
১৩৪৭	২৮	১৩৫৫	১৬	
১৩৪৮	৮			
১৩৪৯	১১			

অভাবে জানা যাচ্ছে না। সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছে না সেখানে মোট কত ছাত্র অবস্থান করত এবং কতদিন পর্যন্ত ছাত্রাবাস চালু ছিল।

মণিপুরীদের অগ্রগতি ঃ রাজন্যশাসনের শেষ কয়েক বৎসরের মণিপুরী অগ্রগতির চিত্র নিম্ন সারণীতে প্রদর্শিত হল।

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ঃ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৩৪২ ত্রিপুরাব্দ থেকে শহরের মোট ৪টি বিদ্যালয় যথা উমাকান্ত ,তুলসীবতী, বিজয়কুমার ও ঠাকুরপল্লী স্কুলে উক্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হয় এবং খুব সম্ভবত ভারতরাষ্ট্রে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত এই কার্যক্রম চালু ছিল। এই কার্যক্রমে মণিপুরী ছাত্রছাত্রীদের যোগদানের চিত্র কিরূপ ছিল তা নিম্নের সারণী থেকে জানা যাবে।

অন্যান্য পার্বত্য জাতির সঙ্গে উপজাতীর না হয়েও মণিপুরীগণ কেন ঐসব বিশেষ সুবিধা পেত তার কারণ বিবরণী বা শিক্ষা দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বা রাজকীয় ঘোষণা সমূহেও পাওয়া যায় না। তবে অবশ্যই বিবাহসূত্রে মণিপুরী রাজবংশধর এবং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মণিপুরীগণ ও ত্রিপুরার রাজপরিবারের বা তাদের বংশধরগণের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

রাজকুমার ঃ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচলিত নিয়মানুসারে শাসক মহারাজার পুত্রগণ মহারাজকুমার, মহারাজা কার্যভার গ্রহণ করার পরে তাঁর অপর ভ্রাতৃবর্গের পুত্রগণ কুমার নামে অভিহিত হত। এঅধ্যায়ে মহারাজ কুমার ও রাজকুমারদের শিক্ষা কীভাবে চলত তাই আলোচিত হচ্ছে। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে এ রাজ্যের অনেক শাসক নিরক্ষরও ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে রাজবাড়ি নিযুক্ত বাঙালি গৃহশিক্ষকের নিকট তারা লেখাপড়া শিখতেন। মহারাজ দুর্গামাণিক্য নিজেই স্বীকার করেছেন । বলরাম বিশ্বাস আমার শিক্ষক ছিলেন, আমি তাঁহার নিকট সমস্ত বাল্যজীবন বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি, আমার দ্বারা সেই বলরামের পুত্র রামহরির প্রাণদণ্ড হইতে পারিবে না।" [২৬] মহামান্যবর নবদ্বীপ চন্দ্রের জবানীতিতেও জানা যায় রাজপুত্রদের বিদ্যামান করতেন বাসদুলাল শর্ম্মা বিদ্যাভূর্ষণ। রাজপুত্র উপেন্দ্র চন্দ্র ও নবদ্বীপচন্দ্র তাঁর নিকট লেখাপড়া শিখতেন। বিদ্যাভূষণ তাঁদের সে কালীন রীতি অনুযায়ী ভারতীয় প্রথাগত শিক্ষাই দিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিণী, হিসেব কষার মত অঙ্ক প্রভৃতি শিক্ষনীদীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঈশানচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাঁদের অভিভাবক মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং রাজপুত্রদের যুগ উপযোগী করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ঢাকা জেলা নিবাসী আনন্দ বিহারী সেনকে তাঁদের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। আনন্দমোহন পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত নব্য ভাবধারার যুবক। তাঁর নিকট রাজপুত্রগণ ইংরেজি ভাষা, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি আধুনিক বিষয় শিক্ষালাভ করেন। আনন্দ বিহারী যুবরাজ রাধাকিশোরকেও ইংরেজী শেখাতেন। [২৭] পরে রাধাকিশোরের আমল থেকে সরাসরি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপে মহারাজকুমার ও রাজকুমারদের শিক্ষা মধ্যপ্রদেশে রায়পুর রাজকুমার কলেজে, আজমীড়ের প্রিন্স কলেজে চলত। কিন্তু সূচনায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রাসাদেই গৃহ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে চলত। দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হতেন, একজন অবশ্যই গ্র্যাজুয়েট। মহারাজকুমার শৈলাবাসে গেলেও শিক্ষকগণ তার সঙ্গে যেতেন। এভাবে প্রাসাদে শিক্ষা সমাপনান্তে

তাদের স্কুলে পাঠান হত। সেজন্য কুমিল্লা শহরে তৈরি করা হয়েছিল রাজকুমার বোর্ডিং হাউস ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে। সেখান থেকে মহারাজ কুমার ও রাজকুমারগণ জেলাস্কুলে বা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তেন।

সারণী-ছ

সন ত্রিং	ইং সন	মহারাজকুমার	কুমার	রাণা	মহারাজ কুমার	কুমার	রাণা	মন্তব্য	ত্রিং সন	ইং সন
১৩৩৬	১৯২৬	৪	৪	-	১২		৩		১৩৪২	১৯৩২
১৩৩৭	১৯২৭	৬	৫	১	১১		৩		১৩৪৩	১৯৩৩
১৩৩৮	১৯২৮	১২		২	৮		৩		১৩৪৪	১৯৩৪
১৩৩৯	১৯২৯	১৩		৩	৮		৩		১৩৪৫	১৯৩৫
১৩৪০	১৯৩০	১২		-	৯		২		১৩৪৬	
১৩৪১	১৯৩১	১৫		৩						

বোর্ডিং এ একজন Graduate superintending teacher এবং অন্য একজন Private টিউটর তাদের লেখাপড়া করাতেন। পরবর্তী সময়ে আরও একজন টিউটর নিযুক্ত হন। এই বোর্ডিং এ দেখা গেছে যে রাণার পুত্রগণও পড়তেন। ১৯৩৫ সালের পরে কুমার বোর্ডিং এর কোন খবর পাওয়া যায় না যে কতজন কুমার সে সময়ে ওখানে থেকে অধ্যয়ন করতেন কিন্তু এরমধ্যেই একজন পন্ডিত এবং একজন প্রোফেসর নিযুক্তির সংবাদ পাওয়া যায় কারণ কুমারগণ তখন নিশ্চয়ই কলেজে অধ্যায়ন শুরু করেছেন। কলিকাতার আশুতোষ কলেজেও কেউ কেউ পড়তেন। সাধারণ স্কুলের পড়া শেষ হলে

সারণী-জ

ডে স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা

ত্রিং সন	১৩৩৩	১৩৩৪	১৩৩৫	১৩৩৬	১৩৩৭	১৩৩৮	১৩৩৯	১৩৪০	১৩৪১	১৩৪২ - ১৩৫৩
শির্ক্ষাথী সংখ্যা	৭	৭	৮	৬	৬	৩	১	১	১	সংখ্যা দেখান হয়নি।

মহারাজকুমারদের বৃটিশ সরকারের ইচ্ছেমত মধ্যপ্রদেশের রায়পুরের রাজকুমার কলেজ, আজমীড়ের প্রিন্স কলেজে পাঠান হত। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল যেমন আদিত্য কিশোর কৃষি কলেজে, হেমন্ত কিশোর শিবপুর বি.ই কলেজ ও রুড়কীতে, মোহন কিশোর যাদবপুরে অধ্যয়ন করেছিলেন। কুমিল্লা কুমার বোর্ডিং এর যে চিত্র উদ্ধার করতে পেরেছি তা নিম্ন সারণীতে প্রদর্শিত হল।

মহারাজকুমার ও কুমার আলাদা করে দেখান হয়নি, একসঙ্গে সংখ্যা দেয়া হয়েছে।

সম্ভবত বীরেন্দ্র কিশোরের আমলে রাজপরিবারের একেবারে বালক কুমারদের লেখাপড়া করাবার **জন্য রাজবাড়িতে** ডে স্কুল নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়া হয়। শিক্ষককে বা কারা পড়াতেন জানা যাচ্ছে না **তবে এই স্কুলের** অস্তিত্ব ১৩৫২ ত্রিং সন অবধি বিবরণীতে পাওয়া যায়। ১৩৪৫ ত্রিং সনে ডে স্কুলের **জন্য একজন** টিউটর নিযুক্তির খবর জানা যায়। এর পূর্বেও টিউটরের অধীনেই লেখাপড়া চলত বলে **ধারণা** করা যায় কারণ বীরচন্দ্র ও রাধাকিশোর উভয়েই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে ছিলেন। ডে

স্কুলের শিক্ষার্থী সংখ্যা নিম্ন সারণীতে প্রদর্শিত হল।

রজাকুমারী ঃ ১৩৩৩ ত্রিং সন থেকে শুরু করে ১৩৫২ ত্রিং সং অবধি প্রশাসনিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে রাজকুমারীগণ প্রাসাদেই একজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট এবং একজন পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করতেন। ১৩৫৩ ত্রিং- ১৩৫৫ ত্রিং সনের বিবরণী মোতাবেক রাজকুমারীগণ দুই জন লেডি গ্র্যাজুয়েট এবং একজন শারীর শিক্ষকের অধীনে লেখাপড়া করতেন। লেডি গ্রাজুয়েট শিক্ষিকার বেতনক্রম দেখা যায় মাসিক ১৫০ টাকা এবং এলাউয়েন্স ৫০্ টাকা । ২৮ উক্ত শিক্ষিকার নাম শ্রীমতী পি.গুপ্তা।

সুযোগ সুবিধা ঃ পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে রাজ্যের অভ্যন্তরে স্কুল বা কলেজে পড়ার জন্য মহারাজকুমার ও কুমারগণ ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেতেন। রাজ্যের বাইরে স্কুল,কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য এবং বাইরে থাকার জন্য সমস্ত খরচ রাজসরকার বহন করত। এরজন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল এবং প্রতি বছর শেষে প্রশাসনিক বিবরণীতে প্রকাশিত হত।

১। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন (সম্পাদিত) ঃ ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, আগরতলা ১৯৭১, পৃঃ ২৪২ পরে 'গেজেট'।

২। Tripura Administration Report 1901-02 : P.19

৩। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী অরুণ দেববর্মা (সম্পা) ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মার 'আবর্জনার ঝুড়ি' আগরতলা, ২০০৪, পৃঃ ২২-২৪।

৪। গেজেট ' ঃ পৃঃ৬৭, ২০২ ও ২২৫ দ্রষ্টব্য।

৫। চক্রবর্তী মহাদেব (সম্পাদিত) ঃ Tripura Administration Reports vol III. PP 10560. (Later ' Chakroborty')

৬। ' গেজেট ' ঃ পৃঃ ২৩৫।

৭। তদেব ঃ পৃঃ ৬৭-৬৮।

৮। তদেব ঃ পৃঃ ২২৯-২৩০। (৫.৬. ১৩৩৬ ত্রিং সনের আদেশ)।

৯। চক্রবর্তী ঃ vol III, IV দ্রষ্টব্য। ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং সনের বিবরণী পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, মহাকরণে প্রাপ্ত।

১০। ' গেজেট ' ঃ পৃঃ ৩৫।

১১। তদেব ঃ পৃঃ ৪৪-৪৫।

১২। তদেব ঃ পৃঃ ৪৫।

১৩। তদেব ঃ পৃঃ ৬৯।

১৪। তদেব ঃ পৃঃ ১৯৫ (সারকুলার নং ৯৫২, ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ ত্রিং)।

১৫। তদেব ঃ পৃঃ ২৩৫ (১০ ই আশ্বিন ১৩৫৭ ত্রিং এর আদেশ)।

১৬। চক্রবর্তী ঃ তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড এবং ১৩৫৩-৫৫ ত্রিং সনের বিবরণী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেক্রেটারীয়েট লাইব্রেরী, মহাকরণে প্রাপ্ত।

১৭। 'গেজেট ' ঃ পৃঃ ২৪১।
১৮। তদেব ঃ পৃঃ ২৩০।
১৯। তদেব ঃ পৃঃ ২০১।
২০। তদেব ঃ পৃঃ ২৩৯।
২১। তদেব ঃ পৃঃ ১৯৫ (সারকুলার নং ৯৫২,২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯ ত্রিং)
২২। তদেব ঃ পৃঃ ২১০ ।
২৩। তদেব ঃ পৃঃ ২২৫।
২৪। তদেব ঃ পৃঃ ৪৪-৪৫।
২৫। তদেব ঃ পৃঃ ২৩৪-৩৫ (১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ৪নং সারকুলার)।
২৬। সিংহ কৈলাশচন্দ্র ঃ রাজমালা ১ম ভাগ পৃঃ ১৪৩ ।
২৭। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ, অরুণ দেববর্মা (সম্পাদিত) ঃ নবদ্বীপ চন্দ্র দেববর্মা রচিত 'আবর্জনার ঝুড়ি' , পৃঃ ৫-৬।
২৮। গেজেট ঃ পৃঃ ২৩৩ (২.৫.৫৭ ত্রিং এর ১৬৯৯-১৭০০ নম্বরের আদেশ)

নারী শিক্ষা

ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরাতে আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য সার্বিকভাবে শিক্ষার প্রসার বিশেষ উল্লেখ বলে বিবেচনা না করলেও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজকীয় উৎসাহ পৃষ্ঠপোষকতা উল্লেখযোগ্য। তিনদিকের সীমানায় অবস্থিত বৃটিশশাসিত বঙ্গদেশের জেলাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট এই রাজ্যে নারী শিক্ষার প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

ত্রিপুরাতে নারী শিক্ষার মশাল জ্বেলেছিলেন এক রাজবধূ। তিনি আগরতলার নিকটবর্তী নলগড়িয়া নামক গ্রামের এক মণিপুরী কৃষক খোঙ্গাস রূপানন্দ সিংহের কন্যা। ১ রাধাকিশোর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর তৃতীয় মহারানি, তুলসীবতী। ১৩০০ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৮৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজবাটীতেই বালিকাদের জন্য একটি পাঠশালার সূচনা করেন। প্রথম দিকে রাজ অন্তপুরের উচ্চ শ্রেণিভূক্ত বালিকারাই ওখানে লেখাপড়া করতো। পরে শ্রেণিবিভাগ উঠে গিয়ে সত্যিকারের বালিকা বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিদ্যালয়ের খরচ সংস্থান করতেন মহারাণী স্বয়ং নিজ তহবিল থেকে। পরে অবশ্য রাজ সরকার ব্যয়ভার বহন করতে থাকে। দুবার স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান স্থানে স্কুল চলে আসে। তাঁরই নামে উহার নামাকরণ করা হয় মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৯৭ খ্রিঃ উহা স্কুলে উন্নীত হয়। ক্রমে ১৯১৫-১৬ খ্রিঃ, ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে ব্রাঞ্চ হাইস্কুল এবং শেষে ১৯৪১-৪২ খ্রিস্টাব্দে হাইস্কুলে পরিণত হয়।

এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গতানুগতিক লেখাপড়া ছাড়াও এই বিদ্যালয়ে বালিকাদের নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্কন, সূচিশিল্প, পুষ্পসাজ রচনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। শিল্পীরূপে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করা হত। এ প্রসঙ্গে অনুপ্রেরণা জোগাবার একটি নমুনা পেশ

করা যেতে পারে। ১৩২৮ ত্রিং সনের এক বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। " বর্তমান বর্ষে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় কর্ণেল শ্রীযুত ঠাকুর মহিম চন্দ্র দেববর্মন মহোদয় উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট " ত্রিপুরার প্রচলিত ধরনের পুষ্প সাজ" প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিবে তাহাকে " বীর বিক্রম কিশোর পদক" নামক একটি রৌপ্য পদক প্রদানকরিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।" প্রত্যেক বিভাগে এভাবে ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হত বলে জানা যায়।

এই বিদ্যালয় সষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি ও গভর্ণর নিযুক্ত করার সংবাদ জানা যায়। ১৩৩০ ত্রিং সনের ১৬ই শ্রাবণের এক আদেশে দেখা যায় সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাকে গভর্ণর পদে নিযুক্ত করে ঐ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির মধ্যে সভাপতি রূপে বিজয়কুমার সেন এবং সদস্যরূপে উজীর ব্রজকৃষ্ণদেববর্মা, সদর বিভাগের কালেক্টর , রাজস্ব ও বনকর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক এবং সম্পাদক রূপে শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যকারক দায়িত্ব পেয়েছিলেন। [৩]

তুলসীবতীর বালিকাদের জন্য আলাদা বোর্ডিং হাউস ছিল, এখনও আছে। ঐ বোর্ডিং হাউস দূরবর্তী স্থানের বালিকাদের আবাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। যদি বর্তমানে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে না তবু নিশ্চয়ই ঐ বোডিং-এ টিউটর সুপারিনটেনডেন্ট প্রভৃতি ছিলেন এবং বিনা ব্যয়ে বালিকারা বাস করত। পূর্বে উল্লিখিত ত্রিপুরা বোর্ডিং এর সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করে সুযোগগুলি বালিকাদের জন্য লব্ধ ছিল বলে মনে করা যেতে পারে। শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক কিন্তু পরে নানা চাপে ও আর্থিক অবস্থার অবনমে ছাত্রীদেরনিকট হতে বেতন নিলেও ত্রিপুরার আদিবাসী, মণিপুরী, রাজকুমার ও কুমারদের এবং ঠাকুরদের মেয়েদের বেতন লাগতনা। কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে বেতন দেয়া বাধ্যতামূলক হয়েছিল - " The above rate Tution Fees will also be levied to the girls of

ত্রিং সন	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	মন্তব্য
স্কুল সংখ্যা	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	৩	৬	৫	৫	৪	৪	উপরের লাইনের সনগুলোর পূর্বে ১৩০০ বসাতে হবে
ছাত্রী সংখ্যা	৯৩	৯১	৭০	৮৫	৯৫	৮৬	৫৬	৮৫	৮৫	৮৯	৭৭	৬৮	৭৪	১২১	১৫৩	১৪৫	৩৭৩	২১৫	২৬৭	২৮৭	২২৩	২৩২	৩৫০	

" M.T.B. Girls School at Agartala from 1.1.56 T.E" [৪] গেইম চার্জ, লাইব্রেরী ফ্রি, ও ভর্তি ফিস আদায় করা হত।

পরবর্তীকালে সরকারি অন্যান্য হাইস্কুলের শিক্ষকদের ন্যায় তুলসীবর্তী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতনক্রম দেওয়া হলেও প্রথমদিকে রাজ্যের অন্যান্য স্কুলের মতই এখানেও শিক্ষিকাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ১৫ই জুলাই ১৯২৩ খ্রিঃ শিক্ষকদম্পতির জন্য আহ্বায়িত পত্রে দেখা যায়, সহকারী শিক্ষিকা ও সহকারী শিক্ষক নিযুক্তির বেতন ৫০ টাকা (৩০ + ২০ টাকা) বলে উল্লেখ করা

সারণী-খ-(পাঠশালা)[৮]

ত্রিং সন ১৩	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫
স্কুল সংখ্যা	১১	৯	৯	৯	১০	১০	১০	১০	১০	৯	৯	৯	৫	৯	৯	১	১			৫৩	৭৮	৮৩	৮৬
ছাত্রীসংখ্যা	২০২	১৯০	১৯২	১৮৯	২৩৪	৩১৯	৩০২	২৯১	২৯১	২৭৩	৩১৯	৩২৯	১৩৮	২৭৮	২৮৬	৪৪	৫৯			২১১৬	২১১২	৩০৯২	৩২৬৬

হয়েছে। অবশ্য শিক্ষকদম্পতিকে বসবাসের জন্য পাকা বাড়ি বিনা ভাড়ায় দেওয়া হবে বলে উল্লিখিত হয়েছে। ৫ বিশেষ শিক্ষিকাদের বেতন সাধারণ শিক্ষিকাদের বেতনের সমান ছিল বলে ধারণা করা যায় না। একজন সংগীত শিক্ষিকা/ শিক্ষকের বেতন দেখা যায় মাসিক ১৫ টাকা। ৬ অন্যান্য বিশেষ শিক্ষক/ শিক্ষিকাদের বেতন ক্রম কি ছিল তা সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছে না।

এভাবে ১৮৯০ সালে নারী শিক্ষার সূচনা করে, ক্রমে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন মহকুমার সদরে, জনবহুল বাণিজ্যিক কেন্দ্রের সমতল ভূমিতে স্কুল স্থাপন চলতে থাকে। রাজ্যের স্কুলের পর্যায় পূর্বে উল্লেখ করেছি যথা পাঠশালা- এল.ভি এইচ ডি- এম.ই- হাইস্কুল। পার্বত্য অঞ্চলে দুর্গম স্থানে স্থাপিত পাঠশালা ও এল.ডি স্কুলে ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়াশোনা করত। সেখানে বালিকাদের জন্য আলাদা স্কুল তৈরি হত না। ছাত্রীরা অভাবে বা অন্যকারণে কোন কোন

সারণী-গ [৯] (এল.ভি.স্কুল)

ত্রিং সন	১৩৩৩	১৩৪৮	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১	১৩৫২	১৩৫৩	১৩৫৪	১৩৫৫
স্কুল সংখ্যা	১১	৮	৫	৩	৬	৫	৫	৪	৪
ছাত্রী সংখ্যা	২০২	২৭০	১৫৫	২২২	২৪৫	২২৩	২৩১	২০৯	২৫৬

বৎসর স্কুল উঠে যেত, পুনরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রী পেলে স্কুল চালু হত। রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বৎসরের চিত্র নিম্নসারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী-ক (মাইনর স্কুল) [৭]

এখানে দেখা যাচ্ছে ১৩৩৩ ত্রিং সাল ১৩৪৯ ত্রিং সাল পর্যন্ত রাজ্যে ১টি মাত্র M.E স্কুল বালিকাদের জন্য। উহা অবশ্যই মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়। ১৩৫০ ত্রিং সনে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে

সারণী-ঘ [১০](বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা)

বিদ্যালয়ের নাম	১৩৫৩ত্রিং	১৩৫৪ ত্রিং	১৩৫৫ ত্রিং	মন্তব্য
উমাকান্ত একাডেমি	১২১	১৩০	১৪৯	সংখ্যা
মহারাণী তুলসীবতী	৬০	৮৭	১৩১	না জানায়
বিজয় কুমার	৭০	৭৮	৮৪	জাতি উপজাতি
ঠাকুর পল্লী	৩৬	৪১	৫০	ছাত্রী সংখ্যা বিভাজন দেখানগেল না।

৩ হয় এবং পরবর্তী বৎসরে ৬ এ পরিণত হয়। তারপর আবার কমে গিয়ে পরের দুই বৎসরের সংখ্যা দেখা যায় ৫ এবং ৫৪ ও ৫৫ ত্রিপুরাব্দে কমে দাঁড়ায় ৪এ। সংখ্যা কমা বা বাড়ার বিশেষ কারণ বিবরণীতে উল্লিখিত হয়নি।

এই সারণীতে দেখা যায় ১৩৫০ ও ১৩৫১ ত্রিং সালে রাজ্যে বালিকাদের জন্য পাঠশালা নেই। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ঐ সময়ে বালিকাদের L.V স্কুলে পাঠিয়ে পাঠশালা বন্ধ করা হয়েছিল। আবার

সারণী-৬ [১১](বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা)

	পাশ	করা	ছাত্রী	সংখ্যা	বৃত্তি প্রাপ্ত	
ত্রিং সন	এইচ ভি	এম.ই	এল.ভি	পাঠশালা	পুরস্কার সংখ্যা	বৃত্তির হার
১৩৪১	৩	৬	১৬	৩৪	৬	২ টাকা-৫ টাকা২-৪বছরের মধ্যে
১৩৪২	x	x	১৮	৪১	৩	
১৩৪৩	x	১৩	x	৬০	৬	
১৩৪৪	২	৬	৩৫	৬০	৪	
১৩৪৫	x	৮	৩০	৫৫	৫	
১৩৪৬	৩	৯	৩৮	৯৯	৫	
১৩৪৭	৩	৮	৩৫	৮২	৬	
১৩৪৮	৪	১৬	৩৮	৮২	৫	
১৩৪৯	x	১৩	৪৭	১৬৫	৫	
১৩৫০	২	২৮	৪২	১১৫	৮	
১৩৫১	x	১০	৪৬	১০৩	৭	
১৩৫২	x	১২	২৬	৪১	৭	
১৩৫৩	x	১২	২৬	৪১	১০	
১৩৫৪	x	১২	২২	৮৭	৮	
১৩৫৫	x	৯	২৩	৭৫	৮	

১৩৫২ ত্রিং সন থেকে পাঠশালার সংখ্যা অনেক বেশি দেখা যায় এবং ক্রমে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৩৫৫ ত্রিং সনে ৮৬ তে গিয়ে পৌঁছায়। এই ক্রমাগত কমা বাড়ার কোন কারণ বিবরণীগুলিতে জানান হয়নি। এ ব্যাপারে পরের অধ্যায়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

স্কুল সম্পর্কে ১৩৩৩ ত্রিং সনের বিবরণীতে দেখা যায় মোট স্কুলের সংখ্যা ছিল ১১ এবং ছাত্রীসংখ্যা ২০২। কিন্তু পরবর্তী কালে বিবরণীগুলিতে ঐ স্কুলগুলি সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নেই বলে ধারণা করা যেতে পারে যে বিদ্যালয়গুলি বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ১৩৪৮ ত্রিং সাল থেকে পুনরায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্রীসংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। নীচের সারণীতে তার

১৩৫৩ ত্রিং সনে আগরতলা শহরে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। এ বিষয়ে পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে শহরের চারটি স্কুলে যথা উমাকান্ত একাডেমী, মহারাণী তুলসিবতী বালিকা বিদ্যালয়, ঠাকুরপল্লী বিদ্যালয় ও বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম চলে। ১৩৫৩-১৩৫৫ পর্যন্ত ঐ সমস্ত স্কুলে কত সংখ্যক ছাত্রী ঐ প্রকল্পের আওতায় এসেছিল তা নিম্ন সারণী থেকে স্পষ্ট হবে।

ত্রিং সন	ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বর্সা ছাত্রীর সংখ্যা	মোট পাশ ছাত্রীর সংখ্যা	পাশের		ডিভিশন
			১ম	২য়	৩য়
১৩৫৩	৫	৪	x	১	৩
১৩৫৪	৬	৪	x	২	২
১৩৫৫	৯	৭	x	২	৫

রাজ্যে প্রতিবৎসর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত ও ধারাবাহিকভাবে এখনও হচ্ছে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বাছাই করা ছাত্রীরা বৃত্তি পরীক্ষায় বসত, সাফল্য অর্জন করত এবং বৃত্তিও পেত ভবিষ্যতের পড়াশেনা চালাবার জন্য। রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বৎসরের বৃত্তিপরীক্ষায় ছাত্রীদের ছবি নিম্ন সারণীতে উল্লেখ করা হল।

বিবরণীগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রাজ্যে মেয়েদের জন্য আলাদা কোন এইচ .ভি. স্কুল ছিল না। রাজ্যের ১টি মাত্র এইচ.ভি. স্কুলে বালক বালিকা একই সঙ্গে পড়ত। সেজন্যই বৃত্তি পরীক্ষয় এইচ.ডি. স্কুল থেকে মেয়েদের দেখান হয়েছে।

সারণী- চ ১২ (ম্যাট্রিক পাশ ছাত্রীর সংখ্যা)

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৩৫০ ত্রিং সনে তুলসীবতী স্কুল হাইস্কুলে উন্নীত হয়। সেক্ষেত্রে ৪১-৪২ খ্রিঃ অর্থাৎ ১৩৫১ ত্রিং সনে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসার কথা, কিন্তু ১৩৫১ ত্রিং সনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়নি। তাই ১৩৫২ ত্রিং সন থেকে ঐ স্কুলের মেয়েদের সাফল্য নিম্নসারণীতে উল্লেখ করা হল। অবশ্য রাজন্য শাসনের একেবারে শেষ পর্যাযের এই চিত্র।

পাদটীকা

১। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা , পৃঃ ১০।

২। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন , পৃঃ ৮৯।

৩। তদেব ঃ পৃঃ ১০৪।

৪। তদেব ঃ পৃঃ ২২৭।

৫। তদেব ঃ পৃঃ ১২২।

৬। তদেব ঃ পৃঃ ২১২।

৭। চক্রবর্ত্তী মহাদেব (সম্পাদিত) ঃ Administration Reports of Tripura vol III Vol IV হতে সংগৃহীত।

৮। তদেব ঃ ঐ এবং Administration Reports of Tripura 1353,54,55, পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগারের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

৯। তদেব ঃ তদেব।

১০। Administration Report of Tripura, 1943-46. Secretariat library Govt of West Bengal. Art.267.P. 71.

১১। চক্রবর্তী মহাদেব ঃ পূ.উ. Consolidated vol IV and T.A.R. 1943-46.as noted earlier.

১২। T.A.R. 1353,1354, 1355, Art 253. P. 68.

বিশেষ শিক্ষা

সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচল করে রাজ্যবাসীদের শিক্ষিত করার প্রয়াস ব্যতীত ও ত্রিপুরার রাজসরকার প্রজাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে সাহায্যকারী কিছু কিছু কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষার ব্যবস্থা

সারণী- ক [২] আর্টিজান স্কুল -১৩৩৩ ত্রিং ১৩৫৫ত্রিং

ত্রিং সন	বিদ্যালয়	ছাত্র	ত্রিং সন	বিদ্যালয়	ছাত্র	ত্রিং সন	বিদ্যালয়	ছাত্র	ত্রিং সন	বিদ্যালয়	ছাত্র
	সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা
১৩৩৩	১	২৫	১৩৩৯	১	১৩	১৩৪৫	১	২০	১৩৫১	১	২৭
১৩৩৪	১	১৮	১৩৪০	১	২২	১৩৪৬	১	২৩	১৩৫২	১	১৪
১৩৩৫	১	১৩	১৩৪১	১	২৬	১৩৪৭	১	১৯	১৩৫৩	১	
১৩৩৬	১	১২	১৩৪২	১	২৩	১৩৪৮	১	১৯	১৩৫৪	১	
১৩৩৭	১	১০	১৩৪৩	১	২২	১৩৪৯	১	১৮	১৩৫৫	১	৯
১৩৩৮	১	১৮	১৩৪৪	১	২৮	১৩৫০	১	১৯		১	

নিয়েছিল। সে সমস্ত প্রয়াসসমূহ বিশেষ শিক্ষার শিরোনামে আলোচনা করা হচ্ছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়ে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান একেবারে লুপ্ত হলেও, কিছু প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালেও সুপ্ত ছিল এবং বর্তমানে সেগুলির উপযোগিতা নতুন করে উপলব্ধি হওয়াতে পুনরায় নূতন করে চালু করার চেষ্টা চলছে। এই সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে শিল্প শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে টোল ও মাদ্রাসা শিক্ষা, বিশেষ শ্রেণির জন্য নৈশ বিদ্যালয়, কয়েকদিনের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উডবার্ন আর্টিজান স্কুল ঃ রাজ্যের যুবকদের বিভিন্ন কারিগরী কাজে শিক্ষিত করে সুনিযুক্তির প্রয়াসে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্ণর উডবার্ণের নামে আগরতলাতে প্রতিষ্ঠিত হয় উডবার্ন আর্টিজান স্কুল। ১ শিক্ষণীয় বিষয়রূপে লোহার কাজ (কর্মকার), টিন ও পেতলের কাজ, এবং কাঠের কাজ (দারু শিল্প) এই তিন বিভাগ নিয়ে বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। ১৯০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে ফিটারের কাজ অন্যতম বিষয়রূপে গণ্য হয়। আরও পরে বাঁশ ও বেতের কাজ (বাস্কেটরী) শিক্ষাক্রমে স্থান লাভ করে। ঠাকুর বালকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করলেও সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থী স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পেত। প্রশাসনিক বিবরণী সমূহে বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঠাকুর, ত্রিপুরী, মণিপুরী, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণকালে শিক্ষার্থীদের মাসিক ৩-৫ টাকা হারে বৃত্তি দেবার বন্দোবস্ত করা হয়। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু রাজন্য শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত এই স্কুল চালু থাকে। ১৩৪৭ ত্রিপুরাব্দে (১৯৩৭-৩৮ খ্রিঃ) নাম পরিবর্তন করে 'শিল্পাশ্রম' করা হলেও সাধারণ্যে উহা আর্টিজন স্কুল নামেই পরিচিত ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের জন্য নিয়মিত বাজেট

বরাদ্দ ও লক্ষ্য করা যায়। রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বৎসরের **ছাত্রসংখ্যা নিম্নসা**রণীতে উল্লিখিত হল যা নিশ্চয়ই স্কুলটির জীবনীশক্তির পরিচয় দেবে।

এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশান ঃ রাজ্যের **প্রথম হাসপাতাল** ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল) হাসপাতালে ১৩২০ **ত্রিপুরাব্দে মহারানি** প্রভাবতী দেবীর অর্থসাহায্যে একটি মেডিক্যাল স্কুল স্থাপন করা হয়। প্রভাবতী **দেবী উহার নামাকরণ** করেন এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশান। ২৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে স্কুলের **কাজ শুরু** করা হয়। পাশ করার পরে ছাত্রদের L.C.M.S. সার্টিফিকেট প্রদান করা হত। কিন্তু **বৃটিশ সরকারের** তীব্র বিরোধিতার ফলে ১৩২৫ ত্রিং সনে স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হয়। প্রায় ১০০ বৎসর **পরে রাজ্যে** আজ মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হতে চলেছে।

সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে রাজ্যে কলেজ **স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে** শিক্ষিত ঠাকুরদের রাজ্যের প্রশাসনে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার **উদ্দেশ্যে** প্রশাসনিক স্কুল খোলা হয়। এই প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠ্যক্রমের মূল বিষয়গুলি ছিল আইন, সার্ভে এবং লিখন। সার্ভেতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। ১৯০০-১৯০১ খ্রিস্টাব্দে এই প্রশাসনিক স্কুলে মোট ৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। [৪]

রেশম শিক্ষা কেন্দ্র ঃ আগরতলার সন্নিকটে কাশীপুরে রেশম শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করে রেশমের চাষ ও **উৎপাদন শুরু করা হয়** ১৩১৭-১৮ ত্রিং সনে। এই কার্যে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে যোগেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরীকে জাপানে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠান হয়। ১৩২০ ত্রিং সনে ফিরে এসে তিনি রেশমচাষ শিক্ষা কেন্দ্র শুরু করেন। দুইজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দিয়ে স্কুলের কাজ চালান হত। শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হত। এতদ্বারা সর্বধারণকে জানান যাইতেছে যে, এরাজ্যের কাশিপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে

সারণী-খ [৭]

ত্রিং সন	১৩৪১	১৩৪২	১৩৪৩	১৩৪৫	১৩৪৬	১৩৪৭	১৩৪৮	১৩৪৯	১৩৫০	১৩৫১	১৩৫২	১৩৫৩	১৩৫৪	১৩৫৫
শিক্ষার্থী সংখ্যা	২০	২১	২০	২০	২০	২২	২৭	১৮	১৫	১৯	১৯	২২	২০	২১
বৃত্তি পরীক্ষায় বসা শির্ক্ষাথী সংখ্যা	৩	৫	২	৪	২	৩	X	X	X	X	X	X	X	X
পাশের সংখ্যা	২	২	২	৩	২	৩	X	X	X	X	X	X	X	X

রেশমের সূতা প্রস্তুত ও দেশীয় এবং উন্নত ফ্লাইসাটেল তাঁত নানাবিধ বস্ত্র বয়ণ প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা দেখিয়া তাহাদিগের কয়েক জনকে মাসিক ৫্ পাঁচ টাকা হারে বৃত্তি দেওয়া যাইবে। এবং শিক্ষার্থীগণের বাসোপযোগী গৃহ ও সরকার হইতে দেওয়া হইবে। শিক্ষার্থীগণের কার্য শিক্ষানে, অন্যান্য দুই বৎসর কাল উপযুক্ততা অনুসারে মাসিক ১৫/ ২০ টাকা বেতনে এ সরকারের কার্য্য করিতে হইবে। এই মর্মে এক একথানা একরা বনামা দাখিল করিতে হইবে। এ রাজ্যবাসী বিশেষত ঠাকুর বালকগণের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে।" [৫] কিছু কাল চলার পরে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

কৃষি বিদ্যালয় ঃ বীরেন্দ্রনগরে কৃষি খামার স্থাপন করা হয়েছিল। খামারে ধান, পাট, আলু, ইক্ষু প্রভৃতি ফসলের চাষবাস নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করা হয়েছিল। পরীক্ষার ফলানুসারে রাজ্যের নদীগুলির দুই পাড়ের সমতল জমিতে আলুচাষের প্রচলন হয়। কৃষি শিক্ষার জন্য রেশম চাষের দিকে সরকার ঝুঁকে পড়ে এবং ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আদর্শ কৃষি খামার স্থানান্তরিত করা হল কাশীপুরে। স্কুলের কাজ চালাতেন রেশম কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। রেশম স্কুলের অধ্যক্ষের কাজ বাড়লেও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার উপর গুরুত্ব কমে যায়। [৬]

কয়েদি বিদ্যালয় ঃ আগরতলা কেন্দ্রিয় কারাগারের অভ্যন্তরে ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে (১৯২৯-৩০ ইং) সারণী-গ [১০]

ত্রিং সন	টোল	ছাত্র	ত্রিং সন	টোল	ছাত্র	ত্রিং সন	টোল	ছাত্র	ত্রিং সন	টোল	ছাত্র
	সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা
১৩৩৩	৩	৪১	১৩৩৮	৩	৩৪	১৩৪৩	৫	৫০	১৩৪৮	৫	৫৭
১৩৩৪	৩	৩৮	১৩৩৯	৩	৩১	১৩৪৪	৫	৪৭	১৩৪৯	৫	৬৫
১৩৩৫	৩	৩৯	১৩৪০	৩	৩১	১৩৪৫	৫	৬২	১৩৫০	৫	৫১
১৩৩৬	৩	৪২	১৩৪১	৪	৪৩	১৩৪৬	৫	৭৪	১৩৫১	৩	৪১
১৩৩৭	৩	৪৩	১৩৪২	৪	৩৯	১৩৪৭	৫	৭১	১৩৫২	৪	৩৮
									১৩৫৩	৫	৪১
									১৩৫৪	৪	৩৪
									১৩৫৫	৪	৮৭

কারাগারে বসবাসকারী শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের জন্য বিদ্যালয় খোলা হয়। খুব সম্ভবত সেখানে প্রথামিক পর্যন্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ছিল কারণ স্কুলের শিক্ষার্থীরাও বর্ষশেষে প্রাথমিক ও পাঠশালা বৃত্তি পরীক্ষায় বসতে পেত এরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায় এবং অনেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশও করত। ১৩৫৫ ত্রিং সন পর্যন্ত প্রশাসনিক বিবরণীতে কারা স্কুলের সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাদের শিক্ষক কারা ছিলেন সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। নিম্নে সারণীতে বিষয়টি স্পষ্টরূপে দেখা যাবে।

নৈশ বিদ্যালয় ঃ ১৩৩৯ ত্রিপুরাব্দে স্থানীয় ছাত্র সমিতি কর্তৃক আগরতলাতে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়। রাজ সরকার কিছু টাকা মাসিক অর্থসাহায্য হিসাবে প্রদান করত। স্থানীয় ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দিনমজদুরগণ ছাত্র হিসাবে নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ত। ১৩৪১ ত্রিং সালে দেখা যায় ছাত্রসংখ্যা ১৬ জন এবং ১৩৪২ ত্রিং সালে কমে দাঁড়ায় ১২ জন। আর কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। অর্থাভাবে সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং বিদ্যালয়ও বন্ধ হয়ে যায়। [৮]

সংস্কৃতি শিক্ষা ঃ রাজ্যের হিন্দুধর্মাবলম্বী প্রজাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষণ ও প্রসারণের উদ্দেশ্যে রাজ সরকার টোল চতুস্পাঠী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে সাহায্য করত। যদিও টোলগুলির শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষকদের শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা, বেতনক্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু সংস্থাগুলি নিশ্চয়ই সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল। তা না হলে প্রশাসনিক বিবরণীতে টোলের সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা প্রতিবৎসর সরকারি ব্যয়ে ছাপা হত না। টোলগুলিতে কি কি বিষয় পড়ান হত বা কি কি

উপাধির পরীক্ষা হত তা সাক্ষ্যের অভাবে জানা যাচ্ছে না। তবে এই শিক্ষা ধারবাহিকভাবে রাজন্য

সারণী- ঘ [১২]

ত্রিং সন	মাদ্রাসা	শিক্ষার্থী	ত্রিং সন	মাদ্রাসা	শিক্ষার্থী	ত্রিং সন	মাদ্রাসা	শিক্ষার্থী	ত্রিং সন	মাদ্রাসা	শিক্ষার্থী
	সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা		সংখ্যা	সংখ্যা
১৩৩৩	৬	২৭১	১৩৩৮	৫	১১৩	১৩৪৩	৭	২৫৫	১৩৫৩	৪	১৭৩
১৩৩৪	৫	২০৩	১৩৩৯	৫	১৮৬	১৩৪৪	৫	১৭৮	১৩৫৪	৫	১৭৯
১৩৩৫	৬	১০৫	১৩৪০	৫	১৮৬	১৩৪৫	৫	৩৪৭	১৩৫৫	৫	১৮৩
১৩৩৬	৯	১৬৭	১৩৪১	৭	২৩৮	১৩৪৬	৫	২০৩	X	X	X
১৩৩৭	৫	১৩৪২	১৩৪২	৭	৩৮৮	১৩৪৭	৪	১৪২	X	X	X

শাসনের শেষ দিন অবধি চলেছিল। যেখানে মিডল স্কুলের হেডপণ্ডিতের বেতন হার ছিল ১২-১৮ টাকা,অথবা হাইস্কুলের আই.এ পাশ ইঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষকের বেতন হার ছিল ৩০-২-৫০ টাকা [৯] সে ক্ষেত্রে টোলের শিক্ষকের বেতনহার অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। নিচের সারণীতে রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বৎসরের টোল-শিক্ষার চিত্র পরিবেশন করা হল।

যেখানে ১৩৩৩ ত্রিং সনে টোলের সংখ্যা ছিল ৩ মাঝে মাঝে তা বেড়ে ৫ এ দাঁড়ালেও শেষ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪টি টোল ছিল। টোলগুলির অবস্থানও জানা যায় না, তবে আগরতলাতে একটি টোল ছিল জানা যায়। ছাত্রদের বেতন লাগত কি না জানা গেলেও আশা করা যেতে পারে যে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় এই শিক্ষাও অবৈতনিক ছিল।

সংস্কৃতি শিক্ষা ঃ রাজ্যের মুসলমান জনসাধারণের জন্য রাজ্যে মাদ্রাসা, মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মাদ্রাসাগুলির শিক্ষকদের যোগ্যতা, বেতনক্রম ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যাচ্ছে না। যদিও হইস্কুলের আরবী/ ফার্সী শিক্ষকদের বেতন ক্রম ৩০-৪০ টাকা ও উর্দু শিক্ষকের বেতনক্রম ৩০-২-৫০ টাকা ছিল বলে জানা যায়। মাদ্রাসায় কি কি বিষয় পড়ান হত বা কোন কোন উপাধি পরীক্ষার জন্য ছাত্রদের তৈরি করা হত তার কোন চিত্র আমাদের হাতে নেই। তবে মাদ্রাসাতে পাঠরত ছাত্রদের সধারণ বার্ষিক বৃত্তি পরীক্ষায় বসার সুযোগ ছিল। ১৩২৮ ত্রিং সনের ১০ নং সারকুলারে জানা যায় যে "অনেক কাল হইতে শ্রীশ্রীযুতের সরকারি সাহায্যে এ রাজ্যের কতিপয় মাদ্রাসার কার্য্য পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এ যাবৎ ঐ সকল মাদ্রাসার ছাত্রগণের কোনরূপ প্রতিযোগিতা পরীক্ষার বব্যস্থা করা সম্ভব হয় নাই। মাদ্রাসাগুলির পাঠ্যবিষয়াদি নিয়মিত করিবার ও ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আগামী বৎসর হইতে এ রাজ্যের উচ্চ বাংলা , নিম্নবাংলা প্রভৃতি বৃত্তি পরীক্ষার মাদ্রাসার ছাত্রগণ ও প্রতিযোগিতা পরীক্ষার বিধান করাও অফিসের অভিপ্রেত।" [১১] এই ঘোষণায় বোঝা যায় মাদ্রাসার ছাত্রগণের জন্য তাদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় সাফল্যের কিছু কিছু নজীরও দেখা যায়। রাজন্য শাসনের শেষ কয়েক বছরে মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে মাদ্রাসার সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা মাঝে মাঝে বাড়লেও শেষ পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৫ টি মাদ্রাসা সরকারি আনুল্যে চলত। সম্ভবত সাধারণ শিক্ষার ন্যায ছাত্রদের বেতন দিয়ে পড়তে হত না। কিন্তু টোলের ছাত্রসংখ্যা থেকে মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা বেশি ছিল। কারণ সম্ভবত টোলের শিক্ষার

দরজা অব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীর নিকট বন্ধ ছিল এবং মুসলমানের জাত ভাগ নেই বলে সবার জন্যই দ্বার উন্মুক্ত থাকত।

শারীর শিক্ষা ঃ শিক্ষা বিভাগে শারীর শিক্ষা নামে কোন আলাদা দপ্তর ছিল না বা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোনও প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় না। তবে হাইস্কুলে একজন ক্রীড়া শিক্ষক নিযুক্ত হতেন। এ সব ক্রীড়া শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে তাদের বেতনক্রম দেখা যায় মাসিক ২০ টাকা। [১৩] বিদ্যালয়ের ছাত্রদের খেলাধূলা, ড্রিল শেখান তাদের দায়িত্ব ছিল। এছাড়াও আন্তস্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সংগঠন ও অনুষ্ঠান করা তাদের কাজের মধ্যে পড়ত। " এ রাজ্যস্থ সমগ্র স্কুলের জন্য প্রতিযোগিতা প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া ব্যায়াম, ক্রীড়া ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই বিষয়ে উৎসাহ প্রদানের জন্য স্টেট হইতে প্রতি বৎসর একটি রৌপ্য পদক অথবা কাপ প্রদত্ত হইবে। উমাকান্ত একাডেমীর হেডমাস্টার এ বিষয়ে যথাযথ বন্দোবস্ত করিবেন। " [১৪]

গেইম ফি ঃ স্কুলে ছাত্রদের নিকট হতে গেইম ফি বা খেলার চাঁদা আদায় করা হত। ১৩৫৭ ত্রিপুরাব্দের ৩ নং সারকুলারে দেখা যায় মাইনর স্কুলে গেইম ফি আদায়ের নির্দেশ। " সর্বপ্রকার মাইনর স্কুলে নিম্নলিখিত হারে খেলার চাঁদা (গেইম ফি) আদায়ের প্রবর্তন করা যায়। আগামী ভাদ্র মাস হইতে এই চাঁদা নিয়মিত রূপে আদায় করত, গেইম ফণ্ড গঠন করিতে হইবে এবং পৃথক রোকড়ভুক্ত করত প্রতিমাসে মাসকাবারে এই ফাণ্ডের তহবিল দর্শাইতে হইবে। এ বিভাগের মঞ্জুরী গ্রহণান্তে এই ফণ্ড হইতে টাকা ব্যয় করা যাইবে। ৩য় শ্রেণি হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি মাসিক / দুই আনা, ১ ম শ্রেণি ও দ্বিতীয় শ্রেণি মাসিক/ এক আনা " [১৫] হারে চাঁদা আদায় করা হত। হাইস্কুলের শ্রেণিগুলিতেও গেইম ফি আদায় করা হত কিন্তু বর্তমানে কোন দস্তাবেজ পাওয়া যায় না তবে লেকখের মনে আছে এই চাঁদার হার ছিল মাসে চার আনা। বিনাবেতনে পড়ুয়া ছাত্র বা বৃত্তিভোগী ছাত্রদেরও এই চাঁদা দিতে হত।

Boys Scout Association : শারীর শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকলেও Boys Scout Association এর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কারণ রাজ্যের হাইস্কুলেই স্কাউটদের প্রশিক্ষণ ও সমাবেশ হত। ২.৫. ১৩৫০ ত্রিপুরাব্দে Boys Scout Association গঠিতহয় এবং এই সংস্থা ১৯৪০ খ্রিঃ Indian Boys Scout Association এর স্বীকৃতি পায়। ১৩৫১ ত্রিং সনে ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠিত করা হয় উমাকান্ত একাডেমীতে। সেখানে ১৮ জন শিক্ষক যোগদান করে এবং ১৪জন সফলতা লাভ করে। একজন স্কাউটার কাব মাস্টার ট্রেনিং কোর্সে বঙ্গদেশের গঙ্গানগরে যোগদান করে এবং ১ম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়। ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে প্রাথমিক চিকিৎসা, সিগনলিং,স্কাউটিং খেলাধূলা ও অন্যান্য কাজ প্রদর্শিত হয় প্রদর্শনীয় মাধ্যমে।

ভলান্টিয়ার কোর ঃ ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে রাজ্যের তিনদিকের বঙ্গদেশীয় জেলাসমূহে সাম্প্রদায়িক মারামারি দাঙ্গা শুরু হলে তার প্রভাব রাজ্যেও পড়ে কেননা বহুসংখ্যক বাঙালি হিন্দু উদবাস্তু হয়ে রাজ্যে প্রবেশ করে ফলে রাজ্যের আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সেজন্যই রাজ্যের হাইস্কুল সমূহে ১২.১১.১৯৪৭ সালে ভলান্টিয়ার কোর গঠন করার নির্দেশ দেয় রাজ্যের শিক্ষাবিভাগ। বিজ্ঞপ্তিতে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী বলেন —" I feel it necessary to organisea volunteer crop out

of the school boys to help the state Administration in case of necessity during any trouble. Please, therefore, take every possible stops towards that. Our aim in main will be to encourage communal harmony amongst." কোর গঠন করা হয়েছিল এবং বিশেষ করে মহকুমা শহরগুলিতে উঁচু শ্রেণির ছাত্ররা নৈশ প্রহরা দলও গঠন করেছিল এবং শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করত।

লাইব্রেরী ফণ্ড ঃ রাজ্যের স্কুলগুলিতে লাইব্রেরী ছিল। ছাত্রগণ লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করতে পারত। লাইব্রেরীর কাজ চালাতেন একজন শিক্ষক, বিদ্যালয়ে গ্রন্থগারিক নিয়োগ চালু ছিল না। অবশ্য এখনও হয়েছে কি? সম্ভবত পূর্বে লাইব্রেবীর ব্যবহার নিঃশুল্ক ছিল কারণ " ১৩৫৬ ত্রিং সনের ১ নং সারকুলার অনুসারে মাইনর স্কুলসমূহের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নিকট হইতে লাইব্রেরী ফণ্ড বাবদ ৩য় শ্রেণী হইতে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্য্যন্ত মাসিক চার আনা হারে এবং তন্নিম্ন শ্রেণি সমূহে মাসিক দুই আনা হারে চাঁদা আদায় করা হইতেছে। " কিন্তু বিদ্যালয় সমূহে গেইম ফি চালু হবার পরে ১৩৫৭ ত্রিং সনে লাইব্রেরী চাঁদার হার পরিবর্তন করা হয়। এজন্য ১৩৫৭ ত্রিং সনের ৪নং সারকুলারে " ৩য় শ্রেণি হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণি মাসিক/ আনা,শিশু শ্রেণি হইতে দ্বিতীয় শ্রেণি মাসিক/ এক আনা" ১৭ হারে চাঁদা নির্ধারিত হয়। যদিও হাইস্কুল সমূহের জন্য লাইব্রেরী চাঁদার হারের কোন সাক্ষ্য আমাদের হাতে বর্তমানে নেই কিন্তু হাইস্কুলেও লাইব্রেরী ফাণ্ড গঠন করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক। চার আনা হারে চাঁদা দিতে হত তা লেখকের সঙ্গে আছে। বিনা বেতনে পড়ুয়া ছাত্র বা বৃত্তিধারী ছাত্রকেও তক্ত চাঁদা দিতে হত।

সংস্কৃত স্কুল ঃ আগরতলাতে বর্তমানে একটি সরকারি সংস্কৃত কলেজ রয়েছে। রাজন্য শাসনেও আগরতলাতে একটি সংস্কৃত স্কুল চালু থাকার আদেশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮ আদেশটি ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দের পৌষমাসের অর্থাৎ ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের। রাধাকিশোর মাণিক্যের মন্ত্রী উমাকান্ত দাসের সাক্ষর সম্বলিত তক্ত আদেশ রাজ্যে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কথা জানা যাচ্ছে। উক্ত আদেশের পরে আর কোনও সংবাদ ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানা যায় না। বর্তমানের প্রতিষ্ঠানটি কি ঐ পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের পরিবর্তিত বা পরিবর্দ্ধিত রূপ কিনা জানা যাচ্ছে না। নূতন কোন আদেশ বা ঘোষণা আবিস্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে ঐ আদেশ থেকে জানা যাচ্ছে যে বিদ্যালয় প্রত্যহ সকাল সাড়ে ছয়টা থেকে সাড়ে নয়টা এবং সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলত। গুণানুসারে ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রদের ১টি করে ৪ টাকা হারে ২টি বৃত্তি প্রদান করা হত। শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ফল খারাপ করলে বা মন্দ স্বভাব চরিত্রের হলে বৃত্তি হতে বঞ্চিত হত। ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল কিন্তু পাঠ্যসূচি বা পাঠ্যতালিকার উল্লেখ নেই। উপরের শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র নিম্নশ্রেণিতে প্রয়োজনমত অধ্যাপনা করতে পারত। বিদ্যালয়ে দুই বেলা উপস্থিতি একান্ত কাম্য ছিল। অনুপস্থিত হলে বৃত্তি হারান বা দৈনিক দুই পয়সা জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যালয় প্রতি সপ্তমীর দিনে ও ত্রয়োদশীর রাত্রে বন্ধ থাকত এবং এছাড়া হাইস্কুলের তুল্য হিন্দু পর্ব উপলক্ষ্যে ও গ্রীষ্মবাসরে বন্ধ থাকত। ছাত্রদের নামধাম বিষয়ক রেজিষ্টারী, অধ্যাপকের উপস্থিতির রেজিস্টারী ছাত্রদের উপস্থিতির

রেজিস্টারী এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত সরকারি পুস্তকাদি ও অন্যান্য জিনিসের রেজিস্টারী রাখা আবশ্যিক ছিল।

পদটীকা

১। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা, রাধাকিশোর মাণিক্য, আগরতলা ২০০৫, পৃঃ ২৯।

২। প্রশাসনিক বিবরণী ১৩৩৩ ত্রিং— ১৩৫৫ ত্রিং হতে সংগৃহীত।

৩। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ---আধুনিক ত্রিপুরা, বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য,আগরতলা ২০০২, পৃঃ ৩৩।

সারণী-ক [১]

(বেসরকারী উদ্যোগ বনাম সরকারি উদ্যোগ

ত্রিং সন	বেসরকারি	বেসরকারি	ত্রিংসন	সরকারী	সরকারী
	বিদ্যালয় সংখ্যা	বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্য		বিদ্যালয়ের সংখ্যা	বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা
১৩২৩(১৯১৩-১৪)	২৭	৮৮০	১৩২৩(১৯১৩-১৪)	১৪৯	৫৭৫২
১৩২৪ (১৯১৪-১৫	৩৭	১০০৪	১৩২৪ (১৯১৪-১৫	১৫৪	৬৩২১
১৩২৮ (১৯১৮-১৯)	২৩	৬১৮	১৩২৮ (১৯১৮-১৯)	১৪০	৫০৬৪
১৩৩৩ (১৯২৩-২৪)	১১	৪৫৮	১৩৩৩ (১৯২৩-২৪)	১৭১	৫৯৭২
১৩৩৯ (১৯২৯-৩০)	১১	২৪১	১৩৩৯ (১৯২৯-৩০)	১৭০	৭৪০১
১৩৪০ (১৯৩০-৩১)	৪৩	১৩১৮	১৩৪০ (১৯৩০-৩১)	১৭৭	৭৫৮৮

৪। Administration Report . 1900-1901; P. 19.

৫। বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসন্ন ঃ ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন, ১৯৭১, পৃঃ ৩১।

৬। গোস্বামী দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ ঃ আধুনিক ত্রিপুরা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য। পূঃ উ ঃ পৃঃ ৩৪।

৭। প্রশাসনিক বিবরণী ১৩৪১ ত্রিং ১৩৫৫ ত্রিং থেকে সংগৃহিত।

৮। প্রশাসনিক বিবরণী ১৩৪১ ত্রিং- ১৩৪২ ত্রিং দৃষ্ট্রব্য।

৯। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন ঃ পূঃ উঃ সম্পাদকীয় ,পৃঃ ১২।

১০। প্রশাসনিক বিবরণী ১৩৩৩ ত্রিং-১৩৫৫ ত্রিং থেকে সংগৃহিত।

সারণী -খ (সরকারি ও বেসরকারি পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা তুলনা

ত্রিং সন	সরকারিপাঠশালার গড়ছাত্রছাত্রী	ত্রিং সন	বেসরকারী পাঠশালার গড় ছাত্রসংখ্যা
১৩২৩	৩৮	১৩২৩	৩৩
১৩২৪	৪১	১৩২৪	২৮
১৩২৮	৩৬	১৩২৮	২৭
১৩৩৩	৫৪	১৩৩৩	৪২
১৩৩৯	৪৪	১৩৩৯	২২
১৩৪০	৪৩	১৩৪০	৩১

১১। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন ঃ পৃঃ উঃ পৃঃ ৯০।
১২। প্রশাসনিক বিবরণী ১৩৩৩ ত্রিং-১৩৫৫ ত্রিং থেকে সংগৃহিত।
১৩। ত্রিপুরা স্টেট গেজেট সংকলন ঃ পৃঃউঃ পৃঃ ১৯৮।
১৪। ঐ ঃ তদেব , পৃঃ ৬৮।
১৫। ঐ ঃ পৃঃ উঃ পৃঃ ২৩২-৩৩।
১৬। ঐ ঃ পৃঃ উঃ পৃঃ ২৩৬।
১৭। ঐ ঃ তদেব, পৃঃ ২৩৭।
১৮। ঐ ঃ তদেব, পৃঃ ৮-৯।

শিক্ষায় বেসরকারি উদ্যোগ ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন

ত্রিপুরা রাজ সরকারের জনগণের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবার পরে খুবই ধীর গতিতে শিক্ষা বিস্তারের কাজ চলতে থাকে। নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার জন্য সাধারণ মানুষ খুবই কম সাড়া দিয়েছিল প্রথম দিকে। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম দিক থেকে রাজ্যের প্রজাকুলের মানসিক অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটলেও রাজসরকারের আর্থিক দুর্বলতা , সামন্ততান্ত্রিক শাসন কাঠামোর মনোভাব শিক্ষাবিস্তারের কাজে পরিপন্থী ছিল। কিন্তু শিক্ষার আলোকঅরণ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার ফলে কিছু কিছু জনতা শিক্ষার স্বাদ পেয়ে বিস্তারের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল নিজেরাই স্কুল স্থাপন করে এবং স্থাপিত স্কুল পরিচালনা করে। রাজ সরকার দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পারলেও বা স্কুলগুলিকে গ্রহণ করতে না পারলেও বৃটিশ শাসকের নিকট প্রেরিত প্রশাসনিক বিবরণীতে ঐ সমস্ত স্কুলগুলির উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিল। আজ অবধি প্রাপ্ত সবগুলি বিবরণীতে এই তথ্য আছে কিনা জানা নেই তবে লেখকের কাছে রক্ষিত বিবরণীগুলির মধ্যে ১৩২৩,১৩২৪,১৩২৮, ১৩৩৯ এবং ১৩৪০ ত্রিং সনের বিবরণীগুলিতে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। নিম্ন সারণীতে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও সেগুলির ছাত্রসংখ্যা উল্লেখ করা হল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত সময়ে (১৩২৩-১৩৪০ ত্রিং) সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেসরকারি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ঐসব পাঠশালায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। প্রতিটি পাঠশালায় গড় ছাত্রসংখ্যাও সরকারি পাঠশালা থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিল না। নিম্ন সারণীতে তা দেখা যেতে পারে।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিটি পাঠাশালার এরূপ ছাত্রসংখ্যা সেকালের বিচারে অবশ্যই যথার্থ বলতে হবে।

এইসব বেসরকারি পাঠশালা কারা পরিচালনা করত? দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত জনজাতিবর্গের সর্দার বা কোন অবস্থাপন্ন কৃষকের বাড়িতে ঐ সব পাঠশালা বসত। শিক্ষক হিসাবে সমতল বঙ্গদেশের ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার স্বল্প শিক্ষিত বাঙালি যুবক কার্যে নিয়োজিত হত। এই শিক্ষকের থাকা

ও খাওয়ার ব্যবস্থা দলপতি বা সর্দার নিজের বাড়িতেই করত। বাঙালি হিন্দু শিক্ষক নিয়োগের অন্যতম কারণ উপজাতিয়দের মধ্যে ঐরূপ স্বল্প শিক্ষিত যুবকও পাওয়া যেত না। এই শিক্ষকদের কোন নির্দিষ্ট মাসিক বেতন ছিল না। বেতনের পরিবর্তে জুমজাত চাউল, তিল প্রভৃতি শিক্ষককে দেয়া হত। বিদ্যালয় পরে সরকারি সাহায্য পেলে স্কুলটি সরকারি স্কুল হয়ে যেত। নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হতেন বা পুরাতন শিক্ষককেই কার্যে বহাল রাখা হত। সরকারি সাহায্যের পরিমাণ ৬ টাকা থেকে ৮ টাকা । ২ এভাবে এই বাঙালি হিন্দু শিক্ষকরাই ত্রিপুরা রাজ্যের গভীর জঙ্গলে শিক্ষার আগুণ জ্বালিয়ে রেখেছিল যা হয়ত দাউ দাউ করতে জ্বলত না কিন্তু একেবারে নিভেও যেত না। এরা সবাই যে অন্যকাজ না পেয়ে একাজে এসেছিল তাও বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। এটা মানবিক চেতনা তাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অপ্রাসঙ্গিক তবু বলতে হচ্ছে লেখকের খুল্ল পিতাসহ ব্রহ্মচারী বনবিহারী সমতল ত্রিপুরার স্বাচ্ছন্দপূর্ণ গ্রাম্য জীবন পরিত্যাগ করে যুবক বয়সে কাকড়াবনের শিলঘাটিস্থ তৈলবাসী ব্যাপারীর বাড়িতে ঐ রূপ পাঠাশালায় শিক্ষকতা করে সেখান থেকেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে চিরতরে ভারতীয় সমাজে বিলীন হয়েছিলেন। এরূপ কত লোক এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষকতা করতেন কেউ তার খবর রাখে না। এই প্রচেষ্টা চালু ছিল। এবং এর পরবর্তী কার্যক্রম রূপে জনশিক্ষা সমিতির উদ্ভব হয়েছিল ঐতিহাসিক কারণে।

কতিপয় শিক্ষিত যুবক, যাঁরা পরবর্তীকালে রাজ্য শাসনের ভারও পেয়েছিলেন, ১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ ই পৌষ ১৯৪৫ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর ত্রিপুর জাতির নিরক্ষরতা দুর করার জন্য একটি অরাজনৈতিক সংগঠন জনশিক্ষা সমিতির গঠন করেণ। [৩] " আমরা জনশিক্ষা সমিতির সদস্যরা এক একটি এলাকা ভাগ করে নিয়ে গ্রামে গিয়ে মিটিং করে ক্রমশ গাঁয়ে গঞ্জে স্কুলঘর তৈরি করে মাস্টার নিযুক্ত করে রাজার দরবারে হাজির হতাম। এ বিষযে নিয়ম ঠিক হয়েছিল স্থানীয় জনসাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষক নিযুক্ত করে শিক্ষা বিভাগে প্রার্থনা করলে মহারাজ সেই স্কুলকে সরকারি স্বীকৃতি দেবেন। ... এসব স্কুলের স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডি . এ ব্রাউন সাহেবের উপস্থিতি খুব সহায়ক হয়েছিল।" [৪]

জনশিক্ষা সমিতি কর্তৃক স্থাপিত এসব পাঠশালাতে শিক্ষকতা করতেন কারা?' " শিক্ষকদের অধিকাংশই ছিলেন বাঙালি হিন্দু। অবশ্য বোর্ডিং থেকে যারা সেভেন এইট পর্যন্ত পড়ে ফিরে গিয়েছিলেন তাদের সবারই এসব স্কুলে চাকরি হয়ে গিয়েছিল।" [৫] ১৯৪৫ সালেও দেখা যাচ্ছে জনশিক্ষা সমিতিরও সম্বল স্বল্প শিক্ষিত বাঙালি শিক্ষক। একশ্রেণির গুরুর প্রতি তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করলেও এই শ্রেণির গুরুকুলে যারা যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার অরণ্যে শিক্ষার আলোকজ্বেলে রেখেছিলেন, তাঁদের প্রতি কোন রুচিশীল মন্তব্য লক্ষ্য করা যায় না।

জনশিক্ষা সমিতি কর্তৃক স্থাপিত পাঠশালার মোট সংখ্যা নিয়েও যথেষ্ট মতপার্থক্য দেখা যায়। রবীন সেনগুপ্ত মহাশয়ের মতে ৩০০ ও বেশি বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন পায়। ৭ নীলমণিবাবু লিখেছেন আমরা মহারাজের কাছ কে ৩৫০ টির ও বেশি স্কুলের মঞ্জুরী আদায় করেছিলাম। এই স্কুলগুলি ছিল পাঠশালা।" [৮] " জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে ৪৮৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল একথা

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এরমধ্যে তিনশ'য়ের বেশি বিদ্যালয় সরকারি অনুমোদন লাভ করে সরকারি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।"[৯] " ফলে, দুতিন বছরের চেষ্টায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৮৪ টি, এরমধ্যে ৩০০ টি বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি অনুমোদন পাওয়া যায়। গ্রাম পাহাড়ের বিত্তহীন সাধারণ মানুষ এবং এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন সর্দারদের দান চাঁদা ইত্যাতি সম্বল করে বাকি বিদ্যালয়গুলিতে (১৮৪টি) পঠন-পাঠন চলে।"[১০] কিন্তু ১৩৫৫ত্রিং সনের অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ প্রশাসনিক বিবরণীতে উল্লিখিত ত্রিপুরা রাজ্যের মোট স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে পাঠশালা- ৮৬, এল ভি, ৩২, এম.ই-২২ এবং হাইস্কুল ৮টি মোট ১৪৮টি। ১১ হাইস্কুল ও এম.ই স্কুল বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮টি। কিন্তু ১৩৫৭ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে মহারানীর ঘোষণায় প্রাইমারী তথা পাঠশালার সংখ্যা দেখা যায় ২৫০টি। ১২ অর্থাৎ এক বৎসরে ১৩২টি পাঠশালা সরকারি স্কুলে পরিণত করেছিল তা হলে তার সংখ্যা ১৩২ এর বেশি হতে পারে না। অথচ জনশিক্ষা সমিতির বিভিন্ন প্রবক্তাদের মতে গড়ে তিনশতের বেশি স্কুল অধিগ্রহণ করা হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে। ব্যাপারটি কি, মহারানির সরকারি বিবৃতি অসত্য হতে পারে কি?

সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে জনশিক্ষা সমিতি কর্তৃক স্থাপিত অনেক পাঠাশালা মহারাজা বীরবিক্রমের সদিচ্ছায়,শিক্ষামন্ত্রী ব্রাউন সাহেবের কর্ম তৎপরতায় সরকারি স্কুলে পরিণত হয়েছিল। অন্য স্কুলগুলি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের অপেক্ষায় গ্রামের সাধারণ মানুষও আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল সর্দারদের দান অবলম্বন করে চলছিল। সমালোচকগণ জনশিক্ষা সমিতির কার্যকলাপও সাফল্যের সমালোচনাও করেছেন। " প্রসঙ্গক্রমে একথা বলা প্রয়োজন যে জনশিক্ষা সমিতির কাজকর্ম সীমাবদ্ধ ছিল মূলত ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের মধ্যে। অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই আন্দোলনের বিস্তরিত ঘটেনি। সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের প্রায় সকলেই ছিলেন ত্রিপুর সম্প্রদায়ভুক্ত।"[১৩] ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সব অঞ্চলে ত্রিপুরীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেই আন্দোলন জোরদার হয় এবং পাঠশালা বেশি সংখ্যায় স্থাপিত হয় কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলে তার প্রভাব খুব বেশি দেখা যায় না। প্রথমে স্থাপিত যে ১৫টি স্কুলের তালিকা সরোজ চন্দ্র উল্লেখ করেছেন তাতে তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা প্রমাণ হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে যে চেতনা ১৯১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের গরীব মানুষদের নিজেদের উন্নতির জন্য স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী করেছিল সেই চেতনাই ১৯৪৫-৪৬ সালে জনশিক্ষা সমিতির নামে অনেক বর্ধিত আকারে শিক্ষা-যোদ্ধাদের সংগ্রামে টেনে এনেছিল। বিদ্যালয় স্থাপনের সংখ্যাটি এখানে বড় কথা নয় কারণ এই সমৃদ্ধ চেতনাই পরবর্তীকালে ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরার শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল যার ফলে সীমিত আর্থিক অবস্থা নিয়েও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে সংখ্যায় ও উৎকর্ষতায় অনেক বেশি অগ্রসর হতে পেরেছে।

পাটটীকা

১। Administration Report of Tripura for the years 1323, 1324, 1328, 1333, 1339 and 1340 TE.PP 89,156 31. respectively.

২। ত্রিপুরা গেজেট সংকলন ঃ পৃঃ উঃ পৃঃ১৯১।

৩। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী, শুভব্রতদব ঃ পটভূমিকা আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি সংগঠক ও সমসাময়িকদের মূল্যায়ন আগরতলা, ১৯৯৬। পৃঃ ৬৩ (জনশিক্ষা আন্দোলন নিয়ে কিছু কথা -সরোজ চন্দ)।

৪। তদেব ঃ নীলমণি দেববর্মা ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন ঃ ভ্রূণ থেকে বনস্পতি পৃঃ ৪৫।

৫। তদেব ঃ ঐ ঃ ঐঃ পৃঃ ৪৬।

৬। তদেব ঃ ঐ ঃ ঐঃ পৃঃ ৪২।

৭। তদেব ঃ রবীন সেনগুপ্ত ঃ ত্রিপুরা জনশিক্ষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, পৃঃ ৫৮।

৮। তদেব ঃ উপরে উল্লিখিত , পৃঃ ৪৬।

৯। তদেব ঃ সরোজ চন্দঃ উপরে উল্লিখিত , পৃঃ ৬৫ঙগ

১০। তদেব ঃ রমেন্দ্র বর্মন ঃ জনশিক্ষা আন্দোলন ঃ চেতনার অধিকার বিস্তারের প্রসঙ্গ, পৃঃ ৭২।

১১। Tripura Administration Report 1943-46. Art 251, 256, 257 and 258.

১২। ত্রিপুরা গেজেট সংকলন, পৃঃ উঃ পৃঃ ১৫।

১৩। কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী ও শুভব্রত দেব ঃ উপরে উল্লিখিত , সরোজ চন্দ ঃ জনশিক্ষা আন্দোল নিয়ে কিছু কথা, পৃঃ ৬৩।